মাসুদ মাহমুদ

সোভিয়েত্‌স্কি কৌতুকভ

১৯১৭–১৯৯১

সোভিয়েত্‌স্কি কৌতুকভ

(১৯১৭—১৯৯১)

মাসুদ মাহমুদ

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

© মাসুদ মাহমুদ

মূল্য : সত্তর টাকা

কিউপিড প্রকাশনা, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা–১০০০

অক্ষর বিন্যাস : সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, ৪৮/৫–১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩

মুদ্রক : বেইস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৪০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা–১০০০

কয়েকটি গুরুগম্ভীর কথা

উৎকর্ষের বিচারে সোভিয়েত পণ্য বিশ্বের বাজারে সমাদৃত না হলেও সোভিয়েত ব্যঙ্গ এবং কৌতুক বরাবরই ছিলো খুব উঁচুমানের। বস্তুত শাসনব্যবস্থা যেখানে যতো কঠোর, কৌতুক রচনার বিষয়বৈচিত্র্য সেখানে ততো ব্যাপক। আর এই সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে কৌতুক- এবং পরিহাসপ্রিয় সোভিয়েত জনগণ। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পঁচাত্তর বছরের স্থায়িত্বকালে (১৯১৭-১৯৯১) সে-দেশে যে-পরিমাণ ব্যঙ্গ-কৌতুক রচিত হয়েছে, অন্য কোনো দেশে কৌতুকের তেমন প্রবল চর্চা কখনও হয়েছে বা হয় বলে বোধ হয় না।

ইংল্যান্ডের *গার্ডিয়ান* পত্রিকার সাংবাদিক হাঙ্গেরীয় ব্যঙ্গ-পত্রিকা *হোসিপো*-র সম্পাদক টিবোর ফারকাশকে প্রশ্ন করেছিলেন : *প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় সাম্প্রতিকালে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মানের আকস্মিক পতনের কারণ কী?* তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *কৌতুক রচনা বা পরিবেশনের দায়ে হাজতবাসের আশঙ্কা থাকলে কৌতুক হয় অধিকতর সূক্ষ্ম এবং ব্যঙ্গাত্মক।*

ফারকাশ অতিরঞ্জন করেননি এতোটুকুও। কৌতুক রচনা বা বলার কারণে লোকজনকে কারাগারে কিংবা শ্রমশিবিরে পাঠানো শুরু করেছিলেন স্তালিন। ক্রুশ্চেভ এবং ব্রেঝনেভ জিইয়ে রেখেছিলেন সেই ঐতিহ্য। কিন্তু থেমে থাকেনি কৌতুক রচনা এবং প্রচার।

সোভিয়েতেরা তাদের প্রায়-নিরানন্দ জীবনে আনন্দ খুঁজে পেতো মূলত দুটো জিনিসে : ভোদকা এবং কৌতুক। এ-দুটোই ছিলো তাদের জন্য ভয়াবহ বাস্তব থেকে আত্মরক্ষার কিংবা সাময়িকভাবে হলেও পালিয়ে যাবার একটি উপায়বিশেষ। ভোদকা পানের পাশাপাশি কৌতুক পরিবেশন ছিলো একটি ক্ল্যাসিক ব্যাপার।

পুঁজিবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ লোককে আহার, বাসস্থান, কর্ম ও চিকিৎসার সংস্থানের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এসব মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা থাকায় নির্ভার মস্তিষ্কে কৌতুক রচনার ও চর্চার সুযোগ পেয়েছিল সে-সমাজের জনগণ।

মূলত আত্মবিশ্লেষণমূলক সোভিয়েত ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধরন এবং মাত্রা কিছুটা ভিন্নতর। এর প্রধান কারণ, এসবের জন্ম একেবারেই শাসকগোষ্ঠীর অগোচরে এবং নেপথ্যে; প্রচার এবং প্রসার গোপনে, সন্তর্পণে। অনেক কৌতুকই হয়তো তুমুল হাসির নয়, কিন্তু সেগুলো তীব্র শ্লেষাত্মক এবং নির্ভুল লক্ষ্যভেদী। অনেকগুলোই ভাবনার খোরাক যোগায়। কিছু কৌতুক আছে, যেগুলি যতোটা না হাস্যকর, তারচেয়ে বেশি করুণ, মর্মস্পর্শী। বিশাল সম্পদের মালিক এক দরিদ্র দেশের অক্ষম, অথর্ব নেতাদের অদূরদর্শিতা, নির্বুদ্ধিতা, খামখেয়ালী আচরণ এবং পরিণতিতে সমাজের অপরিসীম দুর্দশা এসব কৌতুকের উপজীব্য।

কৌতুক হলো মৌখিক সাহিত্য। এই মৌখিক রচনাগুলোকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার অনেকগুলো অসুবিধেজনক দিক আছে। সবাই জানে, শুধু বক্তব্যের মধ্যেই কৌতুকের মাহাত্ম্য নিহিত নয়। কিন্তু বর্ণনাকারীর পরিবেশনের ধরন, প্রয়োজনীয় বিরতি, কথার সুর, ইশারা, বিশেষ শব্দ বা শব্দমালার ওপর জোর দেয়া ইত্যাদি ছাপার অক্ষরে পাঠকের কাছে পৌছে দেয়া সত্যিকার অর্থেই অসম্ভব। এই অপূর্ণতাটুকু কল্পনায় পূরণ করে নিতে হবে পাঠককে।

বইটির নাম রাখা হয়েছে বাংলা এবং রুশ ভাষার উৎকট সন্ধি করে। ব্যাকরণগত শুদ্ধতা তাতে, স্বাভাবিক কারণেই, নেই।

লঘু চরিত্রের এই বইকে ভূমিকা এবং ধারাভাষ্যকন্টকিত করাটা উচিত ছিলো না। কিন্তু উপায় ছিলো না না করেও।

মাসুদ মাহমুদ
কিয়েভ, ইউক্রেন।

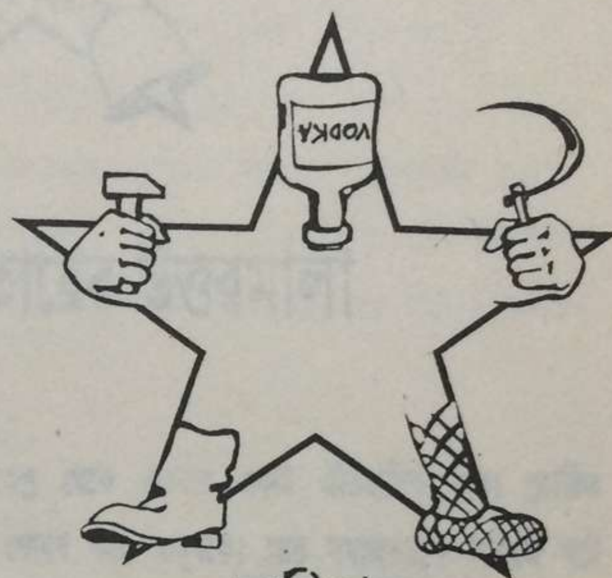

সূচিপত্র

আর্মেনিয়া বেতারের উত্তরমালা	৭
ফৌজি রগড়	২৩
দাঁড়া, খরগোশ, দেখাচ্ছি!	৩৩
লেনিন পর্ব	৪৫
স্তালিন পর্ব	৪৯
ক্রুশ্চেভ পর্ব	৬৩
ব্রেঝনেভ পর্ব	৭৫
আন্দ্রোপভ–চেরনেনকো পর্ব	৯১
গর্বাচভ পর্ব	১০৫

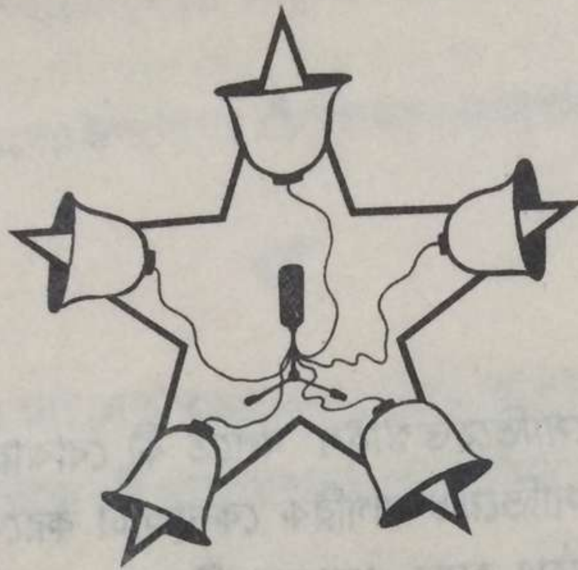

আর্মেনিয়া বেতারের উত্তরমালা

বলা হয়, আর্মেনিয়ার রাজধানী য়েরেভানের বেতারকেন্দ্র থেকে একবার একটি ঐতিহাসিক বাক্য প্রচারিত হয়েছিল। বাক্যটি এরকমঃ 'পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ শোষণ করে মানুষকে। আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে ঘটে ঠিক এর উল্টোটি।'

সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং হাস্যকর এই বাক্যটি প্রচুর আনন্দ দিতে পেরেছিল জনগণকে। আর বাক্যটি ঐতিহাসিক এই কারণে যে, এর পরেই প্রচলিত হয় অনন্য এক কৌতুক-সিরিজ -'আর্মেনিয়া বেতারের উত্তরমালা'। কৌতুকগুলি প্রধানত একটি প্রশ্ন এবং তার সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধরে নেয়া হয় প্রশ্নটি করা হচ্ছে আর্মেনিয়া বেতারকে এবং সেখান থেকে উত্তর দেয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নের। এই 'বেতারের' রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্বল্প কথায় অনেককিছু বলে ফেলে। মজার এই কৌতুক-সিরিজের প্রশ্নগুলো যেমন বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা বোকাটে, সাধারণ কিংবা উদ্ভট, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা রূপক, উত্তরগুলোও তেমন।

– ভুলো মন: সোভিয়েত স্টাইল বলতে কী বোঝায়?

– ধরা যাক, সোভিয়েত নাগরিক কেনাকাটা করতে যাচ্ছে দোকানে। পথের মাঝখানে হঠাৎ হাতে–ধরা ব্যাগটি খুলে ভেতরে উঁকি দিলো সে, তারপর প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো সে দোকানে যাচ্ছে, নাকি ফিরে আসছে দোকান থেকে।

□

– সমাজতন্ত্র কী?

– পুঁজিবাদে পৌঁছুবার দীর্ঘতম পথ।

□

– হিটলার আত্মহত্যা করেছেন কেন?

– গ্যাসের বিল দেখে।

□

– আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে চাই। তো কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে?

– সাইকায়াট্রিস্টের সঙ্গে।

– একেবারে শহরের কেন্দ্রে কোনো মেয়ের সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া কি সম্ভব?

– না, কারণ অন্যদের উপদেশের ঠেলায় কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

□

– সোভিয়েত স্টাইলে নির্বাচন শুরু হয়েছে কবে থেকে?

– যেদিন ঈশ্বর ইভকে সৃষ্টি করে আদমকে বলেছিলেন, *স্ত্রী বেছে নাও।*

□

– শুধু বেতনের টাকায় কি চলা সম্ভব?

– জানি না, চেষ্টা করে দেখিনি।

□

– সোভিয়েত স্ট্রিপটীজ কী?

– নর্তকী নাচের এক পর্যায়ে সব কাপড় খুলে ফেলার অব্যবহিত পরে বসে পড়ে সেগুলোর ওপরে, যাতে কেউ সেসব চুরি করে না নেয়।

□

– ছারপোকার সাইজ চ্যাপ্টা কেন?

– আমরা তাদের ওপরে শুয়ে থাকি বলে।

□

– ছয় ভোল্টের অ্যাকুম্যুলেটর দিয়ে কি মানুষ খুন করা সম্ভব?

– সম্ভব, ছুঁড়ে মারলে।

– সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশলাইয়ের এতো অভাব কেন?

– কারণ সোভিয়েত জনগণ প্রচুর মাংস খায়, কিন্তু টুথ–পিক এখানে উৎপাদিত হয় না একেবারেই।

□

– সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে স্থায়ী কী?

– সাময়িক সংকট।

□

– কুৎসিত কিন্তু বিশ্বস্ত স্ত্রী এবং সুন্দরী কিন্তু অবিশ্বস্ত স্ত্রী – কোনটি ভালো?

– একা একা বিষ্ঠা খাওয়ার চেয়ে সবাই মিলে মিষ্টি খাওয়া ভালো।

:D

□

– টিওডর ড্রাইজার কী করে কমিউনিস্ট হলেন?

– তিনি প্রথমে চেয়েছিলেন *জিনিয়াস* হতে, কিন্তু অতো মগজ ছিলো না তাঁর মাথায়; পরে হতে চাইলেন *টাইটান*, কিন্তু অতো শক্তি তাঁর শরীরে ছিলো না; ভাবলেন *ফিন্যান্সিস্ট* হবেন, টাকায় কুলোলো না। পরে তাঁর জীবনে ঘটলো *আমেরিকান ট্র্যাজেডি*, ফলস্বরূপ তিনি হয়ে গেলেন কমিউনিস্ট।

(সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আমেরিকান লেখক – ড্রাইজার। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর বেশ ক'টি বই অনূদিত হয়েছে। যেমন – জিনিয়াস, টাইটান, ফিন্যান্সিস্ট, আমেরিকান ট্র্যাজেডি ইত্যাদি)

□

– পাউন্ড, ডলার এবং রুবলের পারস্পরিক বিনিময় হার কতো?

– এক পাউন্ড রুবলের মূল্য এক ডলার।

– মোরগ যখন মুরগিকে তাড়া করে, মুরগি তখন কী ভাবে?

– *খুব বেশি জোরে দৌড়চ্ছি না তো?*

□

– আগ্রাসন কী?

– যখন কোনো দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুমতি ছাড়া অন্য দেশ আক্রমণ করে।

□

– পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশ কোনটি?

– কিউবা। তার রাজধানী মস্কোয়, জনগণ থাকে আমেরিকায় এবং তাদের সমাধিস্থল অ্যাঙ্গোলায়।

□

– মস্কোর অলিম্পিক ভিলেজের দালানগুলো কী দিয়ে তৈরী?

– মাইক্রোকংক্রিট দিয়ে।

– মাইক্রোকংক্রিটের উপাদানগুলো কী কী?

– শতকরা পঞ্চাশভাগ কংক্রিট এবং বাকি পঞ্চাশভাগ মাইক্রোফোন।

□

– দশ বছর পরে সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনের ফলাফল কী হবে?

– ক'দিন আগে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস থেকে এই তথ্য সম্বলিত ফাইলটি চুরি হয়ে যাওয়ায় নির্ভুল উত্তর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

– সোভিয়েত জনগণ ক'ভাগে বিভক্ত?

– দু'ভাগে : সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্টদের নিয়ে ডীল করে কেজিবি, আর সন্তুষ্টদের নিয়ে – দুর্নীতি দমন বিভাগ।

□

– ঢেঁকুর কী?

– বিপথে নির্গত দূষিত বায়ু।

□

– অন্তঃসত্ত্বা বালিকা বলতে কী বোঝায়?

– রসজ্ঞানবর্জিত মেয়ে, একটু ঠাট্টা করলেই যে ফুলে বসে থাকে।

□

– চার পা এবং চল্লিশ দাঁত – সেটা কী?

– কুমির।

– আর চল্লিশ পা এবং চার দাঁত?

– কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির পলিট–ব্যুরো।

□

– হাত ঘামলে গন্ধ হয় না, পা ঘামলে হয় কেন?

– হাত এবং পা গজায় কোত্থেকে, তা ভালো করে লক্ষ্য করলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

– ছারপোকার হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কী?

– একগাদা লটারির টিকেট কিনে সেঁটে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে। যদি কোনো একটির ভাগ্যে পুরস্কার জুটে যায়, তো সব ছারপোকা হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে মরে যাবে।

□

– কোনো মেয়ে কি কোনো পুরুষকে লাখপতি বানাতে পারে?

– পারে, পুরুষটি যদি হয় কোটিপতি।

□

– মুর্গির স্তন নেই কেন?

– মোরগের হাত নেই বলে।

□

– কমিউনিস্ট আখ্যা দেয়া যায় কাকে?

– যে মার্কসবাদ–লেলিনবাদের ক্ল্যাসিকগুলো পড়ে।

– আর অ্যান্টি–কমিউনিস্ট কে?

– লেখাগুলো পড়ে যে বুঝতে পারে।

□

– ধূমপান ত্যাগ করার উপায় কী?

– সিগারেট খাবার ইচ্ছে হলে সিগারেটের দু'প্রান্তেই আগুন ধরাতে হবে।

– আদম কি পরনারী গমন করতেন?

– না, কারণ সুযোগ ছিলো না। তবু সন্দেহপ্রবণ ইভ প্রতিদিন আদম ঘুমিয়ে পড়ার পর আদমের পাঁজরের হাড় গুণে দেখতেন।

□

– বেতন কী?

– বেতন হলো মেয়েদের ঋতুস্রাবের মতো। অপেক্ষা করতে হয় সারাটি মাস, তারপর তিনদিনেই শেষ।

□

– ১৯৬৪ সাল কেমন হবে?

– মাঝারি রকমের। ১৯৬৩–র চেয়ে খারাপ, তবে ১৯৬৫–র চেয়ে ভালো।

□

– কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনকে কি বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়?

– অবশ্যই না। কারণ সত্যিকারের বিজ্ঞানীরা যে–কোনোকিছু আগে পরীক্ষা করেন গিনিপিগের ওপরে।

□

– বস এবং অধীনস্থ কর্মচারীর মত বিনিময় বলতে কী বোঝায়?

– অধীনস্থ কর্মচারী বসের ঘরে ঢোকে নিজের মত নিয়ে এবং বেরিয়ে আসে বসের মত নিয়ে।

– পুঁটি মাছ কী?
– কমিউনিজম পর্যন্ত সাঁতরে আসা তিমি মাছ।

□

– সোভিয়েত সূর্য দুপুর বেলায় অতো হাসিখুশি কেন?
– কারণ সে জানে, একটু পরেই পৌছে যাবে পশ্চিমে।

□

– কমিউনিজমের সময় কি প্রেম থাকবে?
– ওই সময় যেহেতু টাকা থাকবে না, তাই প্রেমও থাকবে না।

□

– শরীর থেকে নির্গত দূষিত বায়ুকে পাঁচ ভাগে ভাগ করার উপায় কী?
– দস্তানার ভেতরে বায়ু ত্যাগ করুন।

□

– সোভিয়েত নাগরিক কি নির্ভয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে?
– পারে, চিরতরে বিদেশে চলে গেলে।

□

– একটি দৈনিক পত্রিকা দিয়ে কি হাতি মোড়ানো সম্ভব?
– সম্ভব, যদি সেই পত্রিকায় ছাপা থাকে ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা।

- বোকা নাকি টেকো হওয়া ভালো?
- বোকা হওয়াই ভালো। অতো বেশি চোখে পড়ে না।

□

- পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে দেয়ার উপায় কী?
- সোভিয়েত প্ল্যানিং কমিশনের বিশেষজ্ঞদের পাঠাতে হবে সেখানে।

□

- কুকুরের কি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে?
- পারে, যদি তাকে মানবিক পরিবেশে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়।

□

- দুষ্প্রাপ্য পণ্যে ফ্রিজ ভর্তি করার উপায় কী?
- ফ্রিজের দরজা খুলে তার সামনে রেডিও বা টেলিভিশন চালিয়ে দেয়া।

□

- দর্শন, মার্কসীয় দর্শন, এবং মার্কসীয়-লেলিনীয় দর্শন বলতে কী বোঝায়?
- দর্শন হলো অন্ধকার ঘরে বেড়াল ধরা। মার্কসীয় দর্শন হলো বেড়ালহীন অন্ধকার ঘরে বেড়াল ধরা। আর মার্কসীয়-লেলিনীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হলো বেড়ালহীন অন্ধকার ঘরে বেড়াল ধরেছে বলে বেড়াল-শিকারীর সার্বক্ষণিক চিৎকার।

– পনেরো বছরের মেয়ের সাথে যৌনতা বিষয়ে আলোচনা করা কি উচিত?

– উচিত, যদি এ–ব্যাপারে নিজের জ্ঞানবৃদ্ধির ইচ্ছে থাকে।

□

– পৃথিবীর সবচেয়ে বিলাসবহুল বৃদ্ধ–আশ্রম কোনটি?

– ক্রেমলিন।

□

– কখন গোটা বিশ্ব জুড়ে দুর্ভিক্ষ হবে?

– চীন দেশের লোকেরা যেদিন কাঠি ছেড়ে কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে শুরু করবে।

□

– বিদেশের খবর আমরা কোত্থেকে পাই?

– তাস–এর প্রতিবাদ থেকে।

□

– বিপর্যয় এবং দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে পার্থক্য কী?

– ধরুন, আপনি নতুন স্যুট পরে বেরিয়েছেন রাস্তায়, হঠাৎ চলন্ত গাড়ি আপনার পোশাকে কাদা ছিটিয়ে গেল। এটা দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু বিপর্যয় নয়। আবার ধরুন, সোভিয়েত সরকারের সব সদস্য নিয়ে একটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়লো। এটা বিপর্যয়, কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা নয়।

– ইভ কি আদম ছাড়া আর কারো সঙ্গে শুয়েছিল?
– তা সঠিক জানা যায় না, তবে মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে, এটা প্রমাণিত সত্য।

□

– মার্কসের কাছ থেকে জার্মানি উত্তরাধিকার সূত্রে কী পেয়েছে?
– পূর্ব জার্মানি পেয়েছে *কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার* এবং পশ্চিম জার্মানি পেয়েছে *কাপিট্যাল* ।

□

– স্ত্রী কী?
– স্ত্রী হলো হাতলবিহীন স্যুটকেসের মতো। টানাও কঠিন, ফেলে দিতেও কষ্ট হয়।

□

– দেশে মাংসের আকাল কেন?
– ভেড়াগুলো মেতে আছে বিজ্ঞান নিয়ে, গাভীগুলো জেনারেলদের স্ত্রী হয়ে বসে আছে, ষাঁড়গুলো খেলাধুলো নিয়ে মত্ত, পার্টি এবং সরকারের বড়ো বড়ো পদগুলো দখল করে রেখেছে শুয়োরগুলো, আর এসব দেখে মুর্গিগুলো হাসতে হাসতে মরে গেছে।

□

– ব্রেঝনেভের ভুরু আসলে কী?
– উচ্চতর পদে আসীন স্তালিনের গোঁফ।

– কোথায় মেয়েদের সবচেয়ে কোঁকড়ানো চুল?
– আফ্রিকায়।

□

– মিনিমাম খরচে ম্যাক্সিমাম তথ্য বলতে কী বোঝায়?
– মিনি স্কার্ট।
– আর ম্যাক্সিমাম খরচে মিনিমাম তথ্য ?
– মহাশূন্যে নভোযান উৎক্ষেপণ।

□

– সবচেয়ে নিরাপদ থাকে কোন দেশ?
– যে-দেশের বিশ্বস্ত বন্ধু নেই, – ইজরাইল যেমন চারপাশ দিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত।

□

– বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজ এবং বেতনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, কথাটি কি সত্য?
– মোটেও না, কাজ এবং বেতন বস্তুত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার বেতন দেয়ার ভান করে, আর আমরা ভান করি কাজ করার।

□

– পশ্চাদ্দেশ দেখিয়ে কি ট্রেন থামানো সম্ভব?
– সম্ভব, যদি পশ্চাদ্দেশ হয় লাল রঙের।

– প্রাভদা এবং ইজভেস্তিয়া পত্রিকার মধ্যে পার্থক্য কী?

– প্রাভদায় ইজভেস্তিয়া থাকে না, আর ইজভেস্তিয়ায় প্রাভদা থাকে না।

(প্রাভদা শব্দের অর্থ – সত্য, আর ইজভেস্তিয়া – খবর)

□

– নিরামিষভোজী–নরখাদকেরা কী খায়?

– সবজি–চাষীদের।

□

– হাড়কিপ্টেমি কী?

– লেপের তলায় বায়ু দূষিত করে লেপ দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলা।

□

– দেশের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

– সীমান্ত খুলে দিয়ে অবাধ বিদেশ গমনের সুযোগ দেয়া।

□

– কমিউনিজমের সময় চুরি বিদ্যা কি থাকবে?

– না। কারণ সমাজতন্ত্রের পর্যায় শেষ হতে হতে চুরি করার আর কিছু বাকি থাকবেনা।

– গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?
– সাধারণ চেয়ার এবং বৈদ্যুতিক চেয়ারের মধ্যে যে–পার্থক্য।

□

– আণবিক বিস্ফোরণের পরে কি টয়লেটে যাওয়া সম্ভব?
– সম্ভব, যদি পশ্চাদ্দেশ অক্ষত থাকে।

□

– বহুবিবাহের খারাপ দিক কোনটি?
– বহুশাশুড়ির ব্যাপারটি।

□

– শাশুড়ির ওপরে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লে কী করা উচিত?
– নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেই বুঝুক ঠ্যালা।

□

– শাশুড়ির জন্মদিনে গত বছর চেয়ার উপহার দিলে এ–বছর কী দেয়া উচিত?
– চেয়ারে ইলেকট্রিসিটি দেয়ার ব্যবস্থা করা।

□

– পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে?
– মোরগ। কারণ তার অনেকগুলি স্ত্রী, কিন্তু শাশুড়ি নেই।

– বালিশের কভার দিয়ে আঘাত করে কি শাশুড়িকে হত্যা করা সম্ভব?

– সম্ভব, যদি কভারের ভেতরে ভারী ইস্ত্রি ভরা থাকে।

□

– শাশুড়িকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলে জামাইয়ের কী শাস্তি হবে?

– সমুদ্রের পানি দূষিত করে পরিবেশ দূষণের দায়ে বড়ো অঙ্কের একটি জরিমানা তাকে দিতে হবে।

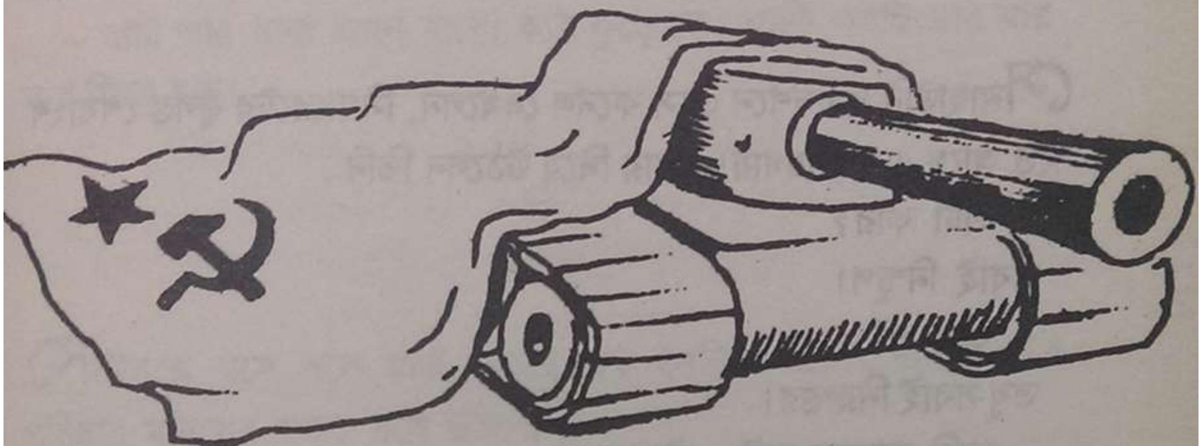

ফৌজি রগড়

মার্চ করতে করতে তাদের মগজ নিচে নামতে থাকে এবং একসময় তা হাঁটুতে এসে পৌছোয় - সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এমন অতিরঞ্জিত কথা পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই প্রচলিত। সোভিয়েত ইউনিয়নও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। সে-দেশে প্রচলিত কৌতুকগুলোয় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের অতি নিম্নমানের বুদ্ধিবৃত্তির মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। কৌতুক কৌতুকই, এসবকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলে গণ্য করাটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

সেনাছাউনি পরিদর্শনে এসে কর্নেল দেখলেন, সিগারেটের জ্বলন্ত শেষাংশ পড়ে আছে এক জায়গায়। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি :

– এটা কার?

সবাই নিশ্চুপ।

– কার এটা?

তবু সবাই নিরুত্তর।

– আমি জানতে চাই, এটা কার?

নিরীহ গলায় বললো একজন :

– কারুর না, স্যার। তুলে নিয়ে খেতে পারেন।

□

অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছেন মেজর :

– ধরা যাক, ট্যাঙ্কের সংখ্যা X; না, খুব কম হয়ে গেল। তারচে' ধরা যাক Y.

□

সামরিক বাহিনীতে কয়েকমাস কাটানোর পর প্রথম ছুটি কাটাতে নিজের গ্রামে এসেছে একজন সৈনিক। বাবা জিজ্ঞেস করলো তাকে :

– কী অবস্থা সামরিক বাহিনীতে?

– জোর যার মুলুক তার।

– মানে?

– দেখতে চাও? আরো রাত হোক, উদাহরণ দিয়ে দেখাবো।

ভোর চারটেয় পিতা–পুত্র বেরুলো ঘর থেকে, দাঁড়ালো মাঠের মাঝখানে, তারপর ঘন্টা বাজাতে শুরু করলো। ঘুম ছেড়ে উঠে এলো সারা গ্রামের লোকজন। ছেলে চিৎকার করে বললো সবার উদ্দেশে :

– আমি আর বাবা এখন যাবো কাঠ কুড়োতে। বাকি সবাই যার যার ঘরে ফিরে যান।

☑

সেন্ট্রিবক্সে বসে বসে মাছি মারছে এক সৈনিক। হঠাৎ একটি মাছি পরিষ্কার মানুষের গলায় বলে উঠলো :

– আমায় মেরো না, আমি তোমার যে–কোনো তিনটে ইচ্ছে পূরণ করবো।

– ঠিক আছে, আমি যেতে চাই নির্জন কোনো দ্বীপে।

সে দেখলো, বিশাল এক নির্জন দ্বীপে সে একা।

– আমি চাই, আমার সাথে থাক অনেক মেয়ে আর অনেক ভোদকা।

তা–ই হলো।

– আমি চাই কিছু না করে বসে বসে টাকা পেতে।

সৈনিকটি সাথে সাথে নিজেকে আবিষ্কার করলো আগের সেন্ট্রিবক্সে। বসে বসে মাছি মারছে সে।

□

জেনারেলের ছোট মেয়ে আব্দার ধরেছে :

– বাবা, আজকেও হাতি তাড়াও।

– না, মা, এখন তো অনেক রাত। হাতিরা খুব ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছে।

– বাবা, হাতি তাড়াও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেলিফোন তুলে নিয়ে তিনি ফোন করলেন মেজরকে :

– আমার অর্ডার শোনো। ব্যাটেলিয়নের সবাইকে ঘুম থেকে তুলে গ্যাসমুখোশ পরিয়ে পাঁচ কিলোমিটার দৌড়িয়ে নাও।

□

দু'জন লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কথোপকথন।

– জানো, সিভিলিয়ানদের মধ্যেও বুদ্ধিমান কিছু লোক আছে।

– বললেই হলো! আছেই যদি, তো তারা কদম মিলিয়ে মার্চ করে চলাফেরা করে না কেন?

□

কর্নেল ডেকে পাঠিয়েছেন সৈনিক ইভানভকে। জেরার সুরে প্রশ্ন করলেন:

– শুনলাম, তুমি তোমার সিভিলিয়ান বন্ধুকে বলেছো, আমাদের মেজর গর্দভ?

– জ্বী না, স্যার। গোপন সামরিক তথ্য ফাঁস করা নিষেধ, তা, স্যার, আমি ভালো করেই জানি।

□

ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের কনসার্টে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিলো দেখে সেক্টরের সৈন্যদের প্রায় সারা পথ তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন মেজর আর সারাক্ষণ চিৎকার করেছেন :

– দেরি হয়ে যাচ্ছে, জোর কদম!

কনসার্ট হলে এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপক ঘোষণা করলেন :

– এখন শুনবেন বীটোফেনের সপ্তম সিম্ফোনি।

সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন মেজর :

– বলেছিলাম না, দেরি হয়ে যাচ্ছে? একটা নয়, দু'টো নয়, ছ'টা সিম্ফোনি ইতিমধ্যে মিস করেছি আমরা।

☐

লেফটেন্যান্টের নতুন বউ আব্দার করে বলছে স্বামীকে :

– ওগো, এমন একটা কিছু বলো, যেন শরীর মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

– অ্যাটেনশান! – কম্যান্ড দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন লেফটেন্যান্ট।

– তারচেয়ে বরং এমন কিছু বলো, যাতে রিল্যাক্সিং মুড আসে।

গলার স্বর বদলালেন না লেফটেন্যান্ট, বললেন :

– স্ট্যান্ড অ্যাট ঈজ!

☐

একজন সৈনিকের বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে বিস্মিত এক মেজর জেনারেল বললেন তাকে :

– তুমি তো, দেখছি, খুব বুদ্ধিমান!

– কে, আমি, স্যার?

– তুমি না তো আমি?

☐

সৈনিকদের ক্লাস চলছে, মেজর বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন।

– পানি বাষ্পে পরিণত হয় নব্বই ডিগ্রী তাপমাত্রায়।

একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো :

– নব্বই না, স্যার, একশো ডিগ্রীতে।

– মাথায় যাদের গোবরও নেই, তাদের জন্য আবার বলছি – পানি বাষ্পে পরিণত হয় নব্বই ডিগ্রীতে।
– কিন্তু, স্যার, বইয়ে লেখা আছে একশো ডিগ্রীর কথা।
অবাধ্য সৈনিকের বক্তব্যের সত্যতা বই ঘেঁটে পরীক্ষা করে দেখলেন মেজর। তারপর বললেন :
– সত্যিই তো! আমি আসলে সমকোণের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

□

নোংরা জুতো পরে বাল্ব বদলাতে চেয়ারের ওপরে উঠলেন কর্নেল। স্ত্রী বললেন :
– একটু নিচে নামো, চেয়ারের ওপরে কাগজ বিছিয়ে দিই।
– দরকার নেই। এমনিতেই নাগাল পাচ্ছি।

□

তরুণ সৈনিক প্রথম ছুটি কাটাতে এলো বাবা–মা'র কাছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে, চারজন মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে গল্প করতে করতে। বাবা–মা ভাবলো, ছেলে বড়ো হয়েছে, এই বয়সে মেয়েদের দিতে তাকাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।
মেয়েগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সৈনিকটি বাবা–মা'র দিতে ঘুরে বললো :
– চারজনের মধ্যে একজনের কদম মিলছে না।

□

রেডিওর ঘোষক সময় ঘোষণা করছে :
– এখন সময় কুড়িটা বেজে শূন্য মিনিট। কম বুদ্ধির লোকদের জন্য

বলছি – এখন সময়–রাত আটটা, নন–কমিশনড অফিসার এবং তরুণ অফিসারদের জন্য বলছি – এখন ঘড়িতে ছোট কাঁটা আটটায় এবং বড়ো কাঁটা বারোটায়, আর সিনিয়র অফিসারদের সুবিধার্থে বলছি – সংখ্যা আট দেখতে অনেকটা মেয়েদের ফিগারের মতো।

□

সেনাবাহিনীর অফিসারদের জন্য বিশেষ এক ধরনের রুবিক'স কিউব তৈরি করা হয়েছে : কিউবটি একরঙা।

□

একজন সিনিয়র অফিসার এবং একজন সৈনিক একটুর জন্য উঠতে পারলেন না ট্রেনে, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলতে শুরু করেছে।

– স্যার, ট্রেন থামানোর ব্যবস্থা করুন, – সৈনিকটি বললো।

কম্যান্ড দেয়ার ভঙ্গিতে সিনিয়র অফিসার চিৎকার করে উঠলেন :

– ট্রেন, হল্ট!

□

ব্রিগেডিয়ার অফিসে এসেছেন। তাঁর এক পায়ে লাল রঙের জুতো, অন্য পায়ে – কালো রঙের। দেখে একান্ত অনুগত এক জুনিয়র অফিসার বললেন তাঁকে :

– স্যার, আপনি বরং ঘরে গিয়ে জুতোজোড়া বদলে আসুন।

– গিয়েছিলাম একবার ঘরে, – বললেন ব্রিগেডিয়ার। – কিন্তু বদলে লাভটা হবে কী? ওখানেও দেখি এরকমই একজোড়া পড়ে আছে।

□

নতুন সৈন্যদের ক্লাস চলছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিষয়ে পড়াচ্ছেন মেজর :

– একটুকরো পাথরকে যতো শক্তি দিয়েই ওপরে ছুঁড়ে দাও না কেন, খানিকক্ষণ বাদেই তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মাটিতে এসে পড়বে।

সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলো :

– কিন্তু পাথরটি যদি, স্যার, মাটিতে না পড়ে পানিতে গিয়ে পড়ে?

মেজর উত্তর দিলেন :

– তা আমাদের না জানলেও চলবে। ওটা নৌবাহিনীর ব্যাপার, আমাদের নয়।

□

কর্নেল ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেনকে, বললেন :

– শোনো, সৈনিক ইভানভের বাবার মৃত্যুসংবাদ এসেছে। তো খবরটা ওকে সরাসরি না বলে একটু অন্যভাবে জানিয়ো। নইলে খুব বেশি দুঃখ পাবে বেচারা।

– ঠিক আছে, স্যার। সে–ব্যবস্থা আমি করবো।

সব সৈনিককে ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেন। সবাই এসে দাঁড়ালো সার বেঁধে। কম্যান্ডের সুরে তিনি বললেন :

– যাদের বাবা এখনও জীবিত, তারা এক কদম এগিয়ে এসে দাঁড়াও।

ইভানভও এগিয়ে আসছিল যথারীতি। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে বললেন :

– তুমি কোথায় চললে, ইভানভ? যেখানে ছিলে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

□

এক সৈনিক প্রশ্ন করলো ক্যাপ্টেনকে :

– স্যার, কুমির কি উড়তে পারে?

– বোকা নাকি তুমি! কুমির উড়বে কী করে? নিজের ঘাড়ে যে-মাথাটা আছে, সেটা দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে শেখো। মাথায় একটু ঘিলু থাকলে এ-কথা তুমি বলতে পারতে না।

– জেনারেল স্যার কিন্তু বলছিলেন, কুমির উড়তে পারে...

– হুম্‌ম্‌! স্যার যখন বলেছেন, হয়তো পারে। তবে খুব নিচ দিয়ে।

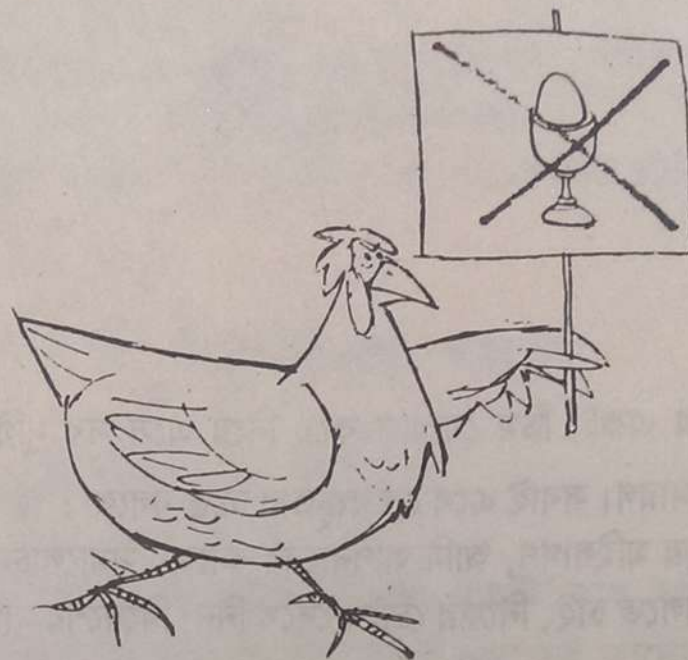

দাঁড়া, খরগোশ, দেখাচ্ছি!

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত সোভিয়েত কার্টুন ছবি YOU JUST WAIT প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। ফলস্বরূপ, নেকড়ে এবং খরগোশকে নিয়ে রচিত হয়েছিল বেশকিছু কৌতূহলোদ্দীপক কৌতুক।

বস্তুত জীবজন্তুকেন্দ্রিক কৌতুক রচনায় সোভিয়েতদের জুড়ি মেলা ভার। শুধু নেকড়ে আর খরগোশই নয়, কচ্ছপ, কুকুর, হাঁস, মুর্গি, জিরাফ, আরশোলা, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, বানর, কুমির খেঁকশিয়াল, কাক, গাভী, ভালুক, শজারু, জলহস্তী, বেড়াল – এমনকি মশাও তাদের রচিত অগণ্য কৌতুকের মুখ্য চরিত্র।

কখনও উদ্ভট, কখনও অ্যাবসার্ড, কখনও রূপক এই কৌতুকগুলোর স্বাদ কিছুটা ভিন্ন, ধরনটিও অনন্য।

উটপাখির একটা ডিম যোগাড় করে নিয়ে এসে সব মুর্গিকে মিটিং-এ ডাকলো মোরগ। সবাই এলে সে বক্তৃতার ঢঙে বললো :

– শ্রদ্ধেয় মহিলাগণ, আমি আপনাদের কাজের সমালোচনা করতে চাই না। শুধু বলতে চাই, নিজের চোখে দেখে নিন, বিদেশের মুর্গিগুলো কেমন ডিমপাড়ে।

□

খরগোশ গেছে পতিতালয়ে।

– সিংহীকে চাই।

– সে এখন ব্যস্ত।

– তাহলে বাঘিনীকে দিন।

– সে–ও ব্যস্ত।

– ঠিক আছে, যে ফ্রী আছে, তাকেই দিন।

মুর্গি জুটলো তার ভাগ্যে। তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো সে। নির্ধারিত একঘন্টা পেরিয়ে গেলেও খরগোশের বেরুনোর নাম–গন্ধ নেই দেখে কড়া নাড়া হলো তার দরজায়। ভেতর থেকে অভিযোগের সুরে বললো সে :

– এমন একজনকেই দিলেন যে, তার কাপড় খুলতে খুলতেই পেরিয়ে গেল এক ঘন্টা।

বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে খরগোশ। দেখলো, আহত গাধা কাঁদছে বসে বসে। খরগোশ খুব সমবেদনা জানিয়ে বললো :

– কে তোমাকে মেরেছে, শুধু নাম বলো। শালার পিন্ডি চটকিয়ে আসবো এখনই।

– ভালুক মেরেছে।

– ও, ভালুক? ভালুক মিছেমিছি কাউকে মারে না।

□

গাছের ডালে বসে আছে তিনটি কাক। একটি কাক ঘড়ি কিনেছে, দ্বিতীয়টি কিনেছে গাভী। তা–ই নিয়ে গর্বের অন্ত নেই তাদের। গল্প শুনে ঈর্ষায় পুড়ে মরছিল তৃতীয় কাক।

পরদিনের ঘটনা। প্রথম এবং দ্বিতীয় কাকের ভীষণ মন খারাপ। ঘড়ি আর গাভী হারিয়ে ফেলেছে তারা। তাই খুব হা–হুতাশ করে গল্প করছিল। শুনতে শুনতে তৃতীয় কাকটি হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো :

– যাই, প্রায় একটা বাজতে চললো। দুধ দোয়ানোর সময় হয়ে এসেছে।

□

নেকড়ে, খরগোশ আর কচ্ছপ বসে আছে একসঙ্গে। মদ্যপানের ইচ্ছে হলো তাদের। কিন্তু কে যাবে বোতল কিনতে? নেকড়ে আর খরগোশ জানিয়ে দিলো, তারা যেতে পারবে না। যেতে হলো কচ্ছপকে।

কিন্তু সেই যে গেল, নেই, নেই, নেই। পার হয়ে গেল অনেকক্ষণ।

– আমি হলে কতো আগে নিয়ে আসতাম! – বললো নেকড়ে।

– এতো ঢিমে তেতালা হলে চলবে কী করে? – খরগোশ মন্তব্য করলো।

ঠিক সেই সময় দরজা খুলে গলা বের করে কচ্ছপ বললো :

– অতো সমালোচনা করলে আমি বোতল কিনতে যেতে পারবো না, বলে রাখছি।

□

বনের ভিতর দিয়ে হাঁটছে খেঁকশিয়াল। হঠাৎ শব্দ ভেসে এলো পাশের ঝোপ থেকে :

– কু–কু–রু–কু!

নির্ঘাত মোরগ! উৎফুল্ল খেঁকশিয়াল ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝোপের ওপর। খানিক্ষণ ধস্তাধস্তির শব্দ। একটু পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো নেকড়ে। মৃত খেঁকশিয়ালকে ধরে রেখেছে মুখে। সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে তৃপ্তির সুরে আপনমনেই বললো সে :

– একটা বিদেশী ভাষা জানার কতো গুণ!

□

টেলিফোন বেজে উঠলো ঘরে। কিন্তু বাসায় কেউ নেই কুকুর ছাড়া। এগিয়ে গিয়ে সে রিসিভার তুললো :

– ঘেউ!

– হ্যালো, কে বলছেন?

– ঘেউ!

– হ্যালো, একটু স্পষ্ট করে বলবেন কি?

– ঘ–য়ে এ–কারে ঘে, আর হ্রস্ব উ।

একটি আরশোলা লাফাচ্ছে তিড়িং বিড়িং করে, হাত-পা ছুঁড়ছে চারপাশে, গড়াগড়ি যাচ্ছে, কখনও দাঁড়াচ্ছে মাথায় ভর দিয়ে। আরেক আরশোলা এসব দেখে জিজ্ঞেস করলো তাকে :

– কী ব্যাপার? ব্রেক ডান্স?

অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে উত্তর দিলো সে :

– না, বন্ধু, নকরোচ।

□

জিরাফের সাথে যৌনসঙ্গম করেছে বলে গোটা বন জুড়ে গর্ব করে বলে বেড়াচ্ছে খরগোশ। কৌতূহলী জীবজন্তুরা জানতে চাইলো :

– তা কেমন লাগলো ব্যাপারটা?

– দারুণ! শুধু চুমু খাবার সময় দৌড়ে যেতে হয়েছে বেশ খানিকটা পথ।

□

– হ্যালো, এটা সার্কাস? কথা বলতে পারে এমন ঘোড়া প্রয়োজন আছে আপনাদের?

– না, – বললেন সার্কাস-পরিচালক এবং টেলিফোন রেখে দিলেন। একটু পরে আবার ফোন।

– হ্যালো, কথা বলতে পারে এমন ঘোড়া আপনাদের দরকার?

– বললাম তো, না, – বলে দুম করে টেলিফোন রেখে দিলেন তিনি। ফোন বেজে উঠলো আবার।

– হ্যালো, লাইন কেটে দেবেন না, প্লীজ। খুর দিয়ে ডায়াল করতে কষ্ট হচ্ছে খুব।

খরগোশ দৌড়ে যাচ্ছে বনের ভেতর দিয়ে আর হাসছে খিকখিক করে। পথে দেখা নেকড়ের সঙ্গে। নেকড়ে প্রশ্ন করলো :

– কী ব্যাপার, হাসছিস যে বড়ো?

– হাসবো না? এই দেখো, গাভীর হারিয়ে ফেলা ব্রেসিয়ার দিয়ে দস্তানা বানিয়ে নিয়েছি।

□

পথের পাশে পড়ে থাকা থুথুড়ে ঘোড়ার পাশে এসে বসলো কাক। ঘোড়া জিজ্ঞেস করলো দুর্বল কণ্ঠে :

– কাক, তোর কিছু দরকার আমার কাছে?

– তুই কবে মরবি, সেই অপেক্ষায় আছি।

– মঙ্গলবারের আগে আমি মরছি না।

– তাতে কী! আমি অপেক্ষা করবো। শুক্রবার পর্যন্ত কোনো কাজই নেই আমার।

□

মোরগ আর হাঁসকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। হাঁস জিজ্ঞেস করলো মোরগকে :

– আমাদের পালক ছেঁটে দেবে নাকি?

– জানি না। ওই ইঁদুরকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

– আচ্ছা, ইঁদুর ভায়া, আমাদের পালক কি ছেঁটে দেবে?

– আমি ইঁদুর নই, শজারু।

খরগোশের কাছে বেড়াতে এসে হঠাৎ খুব দিলদরাজ হয়ে গেল নেকড়ে। পকেট থেকে টাকা বের করে খরগোশকে দিয়ে এক বোতল ভোদকা নিয়ে আসতে বললো। খরগোশ বেরিয়ে গেল এক ছুটে। নেকড়ে লক্ষ্য করলো, ঘরের কোণে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে মাদী–খরগোশ। এক লাফে তার কাছে গিয়ে তাকে চেপে ধরে নেকড়ে যৌনকর্ম সেরে ফেললো দ্রুত। খরগোশ ফিরে এলো বোতল নিয়ে। গ্লাস বের করলো দু'টো। নেকড়ে জিজ্ঞেস করলো :

– দু'টো গ্লাস কেন? তোর বান্ধবী খাবে না?

– ও আমার বান্ধবী নয়। অন্য শহর থেকে এসেছে এইডস সারাতে।

□

মোরগ ভর্তি হতে এসেছে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে। শিক্ষক দোয়েল তাকে জিজ্ঞেস করলো :

– তুমি তো এমনিতেই চমৎকার গাইতে পারো। তোমার তো স্কুলে ভর্তি হবার কোনো কারণ দেখি না।

– আমারও তো একই কথা। কিন্তু কী করবো? মুর্গিরা এখন ডিগ্রী ছাড়া পাত্তাই দিচ্ছে না।

□

বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভালুক। পথের পাশে গাভী জাবর কাটছে শুয়ে শুয়ে। দু'হাতের পেশি ফুলিয়ে গাভীকে দেখিয়ে ভালুক বললো :

– দেখ, আমি আর্নল্ড্ শোয়ার্ত্স্নেগার!

গাভী তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু নির্বিকার। ভালুকটি আরো পেশি ফুলিয়ে বললো :

– আরে বাবা, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, আমি আর্নল্ড শোয়ার্ত্‌স্‌নেগার!

উঠে দাঁড়ালো গাভীটি। তারপর লেজ দিয়ে নিজের ভরাট স্তন স্পর্শ করে ভালুককে দেখিয়ে বললো :

– দেখ, আমি সামান্থা ফক্স!

□

নেকড়ের বাচ্চা হয়েছে। তাকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে আর আদর করে বলছে সে :

– ঘুমো, বাছা, ঘুমো। কী সুন্দর চোখ তোর! ঠিক মায়ের চোখ পেয়েছিস। দাঁতগুলোও পেয়েছিস মায়ের। আর কানদু'টো? কানদু'টো পেয়েছিস ... খরগোশ, দাঁড়া দেখাচ্ছি!

□

ঠোঁটে ভয়ঙ্কর পোড়া দাগ নিয়ে উড়ছে মশা। অন্য এক মশা জিজ্ঞেস করলো তাকে :

– কী করে ঠোঁট পোড়ালি?

– অন্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটকে জোনাকির বউ ভেবে চুমু খেতে গিয়েছিলাম।

□

দুই শজারুর দেখা। একজনের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করলো অন্যজন :

– হাতে কী হয়েছে?

– তেমন কিছু না। পিঠ চুলকোতে গিয়েছিলাম শুধু।

□

জলাভূমিতে গড়াগড়ি করছে জলহস্তী। জল ছিটোচ্ছে অকারণে। আরেকটি জলহস্তী এসে বললো তাকে :

–ওই পাশের জলাভূমিতে একগাদা ব্যাঙ। চলো, ওদের ভয় দেখিয়ে আসি।

– আমার তো আর খেয়ে–দেয়ে কাজ নেই! এতো সব কাজ ফেলে এখন যাই অকাজে সময় নষ্ট করতে!

□

নেকড়ে বিয়ে করলো মুর্গিকে। এক বছর পর খেঁকশিয়াল বেড়াতে এলো তাদের বাসায়। দেখলো, মুর্গিকে মাটিতে চেপে ধরে তার পালকগুলো ছিঁড়ে ফেলছে নেকড়ে। বিস্মিত খেঁকশিয়াল জিজ্ঞেস করলো তাকে :

– তুমি করছোটা কী, ভায়া?

– আর বলো না। একসাথে ঘর করলাম এক বছর হয়ে গেল। অথচ তাকে ন্যাংটো দেখিনি একদিনও।

□

আহত সিংহ পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো খরগোশ, বললো সবিনয়ে :

– হুজুর, আপনি রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছেন যে? আজ তো বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

– শুয়ে আছি কি আর সাধে রে? গুলি খেয়েছি।

– তাই বলে, হারামজাদা, গোটা পথ জুড়ে তোকে শুয়ে থাকতে হবে?

□

বানর বসে আছে তালগাছের মাথায়। পাশের নদী দিয়ে সাঁতারে যাচ্ছিলো কুমির।

– বানর, ও বানর, কী করছিস তুই ওখানে? – সে জানতে চাইলো।

– আগে দশ রুবল দে, তারপর বলছি।

কুমির তাকে দিলো দশ রুবল, বললো :

– এখন বল, কী করছিস ওখানে?

– কী আর করবো? তালগাছের মাথায় বসে আছি।

– গাধা কোথাকার!

– গাধা হই আর যা-ই হই, তোর মতো বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে দিনে শ'খানেক রুবল কামাই তো করছি।

□

পোলট্রি ফার্মে মুর্গিরা খুব বড়ো আকারের ডিম পাড়তে শুরু করলো। এতে মোরগের খুব বড়ো একটি ভূমিকা আছে ভেবে তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। পুরস্কার হাতে নিয়ে ঘোষনা করলো সে :

– পুরস্কার আমি নিচ্ছি বটে, তবে ওই টার্কিশ মোরগ ব্যাটার থোঁতা মুখ যদি ভোঁতা আমি না করেছি!

২০০০ সালে নদীর পাড়ে শুয়ে আছে তিনটে কুমির।

– এক সময় আমাদের রঙ নাকি সবুজ ছিলো, – প্রথমজন বললো।

– সাঁতরাতেও নাকি পারতাম এক সময়, – বললো দ্বিতীয়জন।

– যথেষ্ট বকবক হয়েছে, – বললো তৃতীয়জন। – চলো, উড়াল দিই। মধু সংগ্রহ করতে হবে না?

□

মাংস এবং মুর্গির দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'টি মোরগ। প্রথমটি বললো :

– চল, দোকানে ঢুকি।

– কেন, কিছু কিনবি নাকি?

– না। কিন্তু ন্যাংটো মুর্গি দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।

□

বেড়ালকে দেখে খিকখিক করে হাসতে হাসতে গাভী বললো :

– অ্যাত্তোটুকুন তুই, অথচ গোঁফ উঠে গেছে। লজ্জা করে না তোর?

বেড়াল বিন্দু মাত্র না ভড়কে উত্তর দিলো :

– আর তুই, ধাড়ি কোথাকার! ব্রেসিয়ার না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস!

□

মরুভূমিতে দৌড়চ্ছে এক কুকুর আর ভাবছে :

– আর এক মিনিটের মধ্যে কোনো গাছ খুঁজে না পেলে এমনি এমনিই প্রস্রাব হয়ে যাবে।

লেনিন পর্ব
(১৯১৭–১৯২৪)

লেনিনের শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৌতুকচর্চা ততোটা প্রবল ছিলো না বলেই বোধ হয়। মহান অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ক্ষমতায় আসেন লেনিন। জনগণের মনে বিপ্লবের রেশ অনেকদিন ছিলো বলেই হয়তো কৌতুকের চাষ ব্যাপক হয়নি সেই সময়। আর শাসক হিসেবে লেনিন ছিলেন যথেষ্ট প্রগতিশীল, দক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ। এসব কারণেই, সম্ভবত, লেনিন ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁকে জড়িয়ে কৌতুকের সংখ্যা সঙ্গত কারণেই নগণ্য।

১৯১৭ সাল। পেত্রোগ্রাদ। রাস্তা–ঘাটে হৈচৈ শুনে এক বৃদ্ধ তাঁর পরিচারিকাকে পাঠালেন ব্যাপার কী জেনে আসতে। সে ফিরে এসে বললো :

– বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।

– বিপ্লব! কী দারুণ ব্যাপার! আমার দাদাও বিপ্লবী ছিলেন। আহা! কী ভালোই না লাগছে শুনতে – বিপ্লব! তো কী চাইছে বিপ্লবীরা?

– চাইছে দেশে যেন কোনো ধনী না থাকে।

– আর আমার দাদা চাইতেন, দেশে যেন কোনো গরীব না থাকে।

□

– ভ্লাদিমির ইলিচ, বেশ কিছুদিন আপনি অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। এখন আপনার উচিত একটু বিশ্রাম নেয়া। কোনো মেয়ে–টেয়ে নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন শহরের বাইরে ...

– হ্যাঁ, মেয়ে সাথে নিয়ে, শুধু ওই রাজনৈতিক বেশ্যা ত্রৎস্কিকে সাথে নিয়ে নয়।

(ত্রৎস্কি ছিলেন লেনিনের অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা। উঁচু দরের তাত্ত্বিক হিসেবে খ্যাত ত্রৎস্কির সাথে লেনিনের মতবিরোধ শুরু হয় মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর। এক পর্যায়ে তাঁকে চিহ্নিত করা হয় লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।)

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম উৎপাদিত কনডমের এক প্যাকেট পাঠানো হলো লেনিনকে। প্যাকেট থেকে একটি কনডম বের করে তা ফুটো করে একজনের হাতে দিয়ে তিনি বললেন :

– রাজনৈতিক বেশ্যা ত্রৎস্কিকে দিয়ে এসো এটা।

□

শিল্পীর আঁকা ছবি – *পোল্যান্ডে লেনিন*। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শুধু দু'জোড়া পা। এক দর্শকের প্রশ্ন :

– পাগুলো কার?

– ফেলিক্স দ্জেরঝিন্স্কি এবং নাদিয়া ক্রুপ্স্কায়ার।

– কিন্তু ছবির নাম তো *পোল্যান্ডে লেনিন* লেনিন কোথায়?

– লেনিন তো পোল্যান্ডে।

(সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন দ্জেরজিন্স্কি। কেজিবি নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের আদিরূপ এ. কে. ভি. ডি.-র উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। আর নাদিয়া ক্রুপ্স্কায়া ছিলেন লেনিনের স্ত্রী।)

□

আমেরিকার মোটরগাড়ি তৈরির কারখানায় বেড়াতে গেছে সোভিয়েত শ্রমিক প্রতিনিধিদল। একজন শ্রমিকের প্রশ্ন গাইডকে :

– এই কারখানাটির মালিক কে?

– ফোর্ড।

– আর কারখানার সামনে পার্ক করানো গাড়িগুলো কার?

– কারখানার শ্রমিকদের।

আমেরিকার শ্রমিক প্রতিনিধিদলের ফিরতি ভ্রমণ সোভিয়েত গাড়ি তৈরির কারখানায়। একজনের প্রশ্ন গাইডকে :

– এই কারখানার মালিক কে?

– কারখানার শ্রমিকরা।

– আর কারখানার সামনে দাঁড় করানো এই গাড়িটি কার?
– কারখানার ডিরেক্টরের।

□

সফল বিপ্লবের পর বাড়ি ফিরে এসে বলশেভিক বলছে তার মাকে :

– এখন সব পাওয়া যাবে দোকানপাটে। খাবার–দাবার, কাপড়–চোপড় – যা চাও। বিদেশেও যেতে দেবে এখন থেকে।

– ঠিক জারের আমালে যেমন ছিলো, তাই না? – মা বললো খুশিতে বাগবাগ হয়ে।

□

সোভিয়েত বেতারকেন্দ্রের ঘোষণা :

– মস্কোয় এখন সময় বেলা তিনটা, স্‌ভের্দ্‌লোভ্‌স্কে – চারটা, তোম্‌স্কে – পাঁচটা, ইরকুত্‌স্কে – সন্ধ্যে ছ'টা, ভ্‌লাদিভস্তোকে – রাত এগারোটা...

মন দিয়ে শুনতে শুনতে মন্তব্য করলেন এক বৃদ্ধ :

– যে-দেশে এতো অব্যবস্থা, এতো অরাজকতা, এতো বিশৃঙ্খলা, সে–দেশের উন্নতি হবে কী করে?

□

কাজে যেতে ভয়ানক দেরি হয়ে যাচ্ছিলো বলে একজন শ্রমিক বাসায় প্যান্ট পরার সময় পর্যন্ত পেলো না। প্যান্ট হাতে নিয়েই দৌড় লাগালো সে কর্মস্থলের উদ্দেশে। তবু দেরি হয়ে গেল তার পৌছুতে। কারণ পথে লোকে অসংখ্যবার থামিয়েছে তাকে, জিজ্ঞেস করেছে – কোথেকে সে কিনেছে প্যান্টটি।

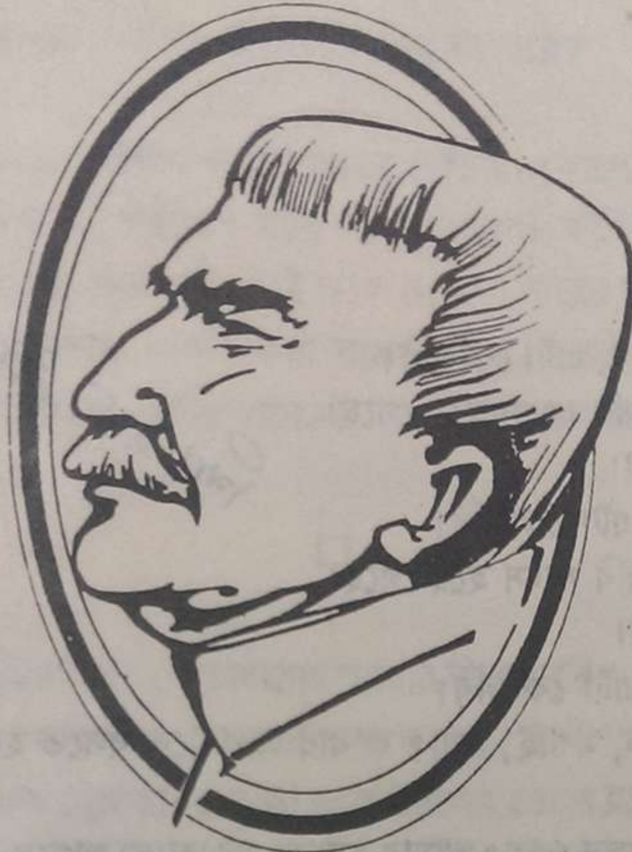

স্তালিন পর্ব

(১৯২৪–১৯৫৩)

সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্রকে ভীতির চোখে দেখতে শুরু করে স্তালিনের শাসনামলে। সেই সময় পার্টি বা সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে কথা বলার দায়ে যাকে-তাকে পাঠানো হয়েছে শ্রমশিবিরে কিংবা কারাগারে। কখন কেজিবি-র লোক এসে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, সেই আশঙ্কায় লোকজন তখন যাপন করতো আতঙ্কিত জীবন। দেশ জুড়ে ছিলো পাতি-গোয়েন্দাদের নেটওয়ার্ক। কৌতুক রচয়িতা এবং পরিবেশন কারীদের জন্যও সেটা ছিলো এক চরম দুঃসময়।

– হ্যালো, এটা কেজিবি?
– না, কেজিবি ধ্বংস হয়ে গেছে।
আবার ফোন।
– হ্যালো, এটা কেজিবি?
– না, কেজিবি ধ্বংস হয়ে গেছে।
আবার ফোন।
– হ্যালো, এটা কেজিবি?
– আপনি কি, মশাই, ঠসা? ক'বার আপনাকে বলতে হবে যে কেজিবি ধ্বংস হয়ে গেছে?
– অতো চটছেন কেন? আমার হয়তো খুব ভালো লাগছে কথাটি শুনতে।

□

স্তালিন বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রমিকদের সামনে :
– আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।
উপস্থিত একজন শ্রমিকের কাছ থেকে চিরকুট এলো তাঁর কাছে। তাতে লেখা : *তাহলে আর দেরি করছেন কেন?*

□

কাক বসে ছিলো গাছের ডালে। নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো খরগোশ।
– কাক, তুই কী করছিস?
– কিছুই না, বসে আছি এমনিতেই।

– বেশ মজা তো! আমিও বসে থাকি কিছু না করে?

– থাক।

হাত-পা গুটিয়ে খরগোশ বসলো গাছের গোড়ায়। ঝোপের আড়াল থেকে খেঁকশিয়াল দেখলো, খরগোশ বসে আছে চুপচাপ। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খেয়ে ফেললো সে। পুরো ঘটনাটাই কাক দেখলো গাছের ডালে বসে এবং ভাবলো : *খরগোশকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম – কিছু না করে বসে থাকলে চলে কেবল তাদেরই, যারা বসে থাকে ওপরে।*

□

জাতীয় এক উৎসবের শোভাযাত্রায় ব্যানার নিয়ে বেরিয়েছে রাবিনোভিচ। তাতে লেখা : *আনন্দময় শৈশবের জন্য কমরেড স্তালিনকে ধন্যবাদ।* তা দেখে পার্টির এক হোমড়া-চোমড়া জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে :

– কমরেড রাবিনোভিচ, আপনি কি ফাজলামো করছেন? আপনি যখন শিশু ছিলেন, স্তালিনের তখন তো জন্মই হয়নি।

– ধন্যবাদ তাঁকে সে-কারণেই।

(রাবিনোভিচ – কল্পিত এক ইহুদি চরিত্র। বেশ কয়েকটি কৌতুকে তাকে নায়ক হিসেবে পাওয়া যাবে।)

□

পোস্টারের দোকানে ক্রেতা।

– পলিট-ব্যুরোর সদস্যদের পোস্টার আছে?

– আছে।

কয়েকটি ছবি বের করে দেখালো বিক্রেতা।

– না, এগুলো চলবে না, – ক্রেতা জানালো।

কফিনে শায়িত লেনিনের ছবি দেখালো সে। জানতে চাইলো :

–এটা চলবে?

– ঠিক এটা নয়, তবে পলিট–ব্যুরোর সবার এরকম ছবি দিতে পারবেন?

মানুষের সুখের রকমফের।

কাজের শেষে ঘরে ফিরে এলো জার্মান। স্ত্রী তাকে খেতে দিলো ঝলসোনো মাংস আর বিয়ার। ডিনার করে শুয়ে পড়লো সে বউকে জড়িয়ে ধরে। তারা সুখী।

ইংরেজ ঘরে এলো কাজের শেষে। স্ত্রীর সাথে ডিনার করে কুকুরকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরুলো সে। তারপর ফিরে এসে বউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। তারা সুখী।

কাজের শেষে ঘরে এলো ফরাসী। বউকে পেলো না ঘরে। এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে সে চললো প্রেমিকার কাছে। তারা সুখী।

কাজের শেষে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার মিটিং–এ বাধ্যতামূলক হাজিরা দিয়ে অনেক দেরি করে ঘরে ফিরলো রুশ এবং তার স্ত্রী – ইভানভ এবং ইভানভা। খুব একচোট ঝগড়া হলো তাদের মধ্যে। তারপর পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো তারা। মাঝরাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

– কে?

– কেজিবি–র লোক। দরজা খুলুন।

তিনজন ঢুকলো ঘরে। একজন জিজ্ঞেস করলো :

– আপনার পদবী পেত্রোভ? আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।

– আপনারা ভুল করছেন, আমি পেত্রোভ নই। পেত্রোভ থাকে আমার ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটে।

একটু পরে ইভানভ আর ইভানভা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, প্রেত্রোভকে গ্রেফতার করে গাড়িতে ওঠানো হলো। ইভানভ আর ইভানভা শুয়ে পড়লো আবার। তারা সুখী।

যৌথ খামারে জুতো সরবরাহ এসেছে মাত্র একজোড়া। তো তা কাকে দেয়া হবে, সে-বিষয়ে মিটিং বসেছে। বক্তৃতা দিচ্ছেন যৌথ খামারের ডিরেক্টর :

– আমি প্রস্তাব করছি, জুতোজোড়া আমাকে দিয়ে দেয়া হোক। এই প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা, তাঁরা চুপচাপ বসে থাকুন। আর সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে যাঁরা, তাঁরা হাত তুলুন।

☑

পুশকিনের মূর্তি নির্মাণ করা হবে। জমা পড়েছে কয়েকটি প্রোজেক্ট। সেসব নেড়েচেড়ে দেখছেন স্তালিন। এক নম্বর প্রোজেক্ট : পুশকিন বায়রনের লেখা বই পড়ছেন।

স্তালিনের মন্তব্য : ঐতিহাসিকভাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নেই এতে।

দুই নম্বর প্রোজেক্ট : পুশকিন স্তালিনের লেখা বই পড়ছেন।

স্তালিনের মন্তব্য : রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটা অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন। পুশকিনের জীবদ্দশায় আমি কোনো বই লিখিনি।

রাজনৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলো তিন নম্বর প্রোজেক্ট : স্তালিন পুশকিনের লেখা বই পড়ছেন।

মূর্তি নির্মাণ করা হলো। উদ্বোধনের পরে দেখা গেল : স্তালিন পড়েছেন স্তালিনের লেখা বই।

□

– পুরো নগ্ন অবস্থায় কি শজারুর ওপরে বসা সম্ভব?

– সম্ভব শুধু তিন ক্ষেত্রে। এক – যদি পশ্চাদ্দেশ নিজের না হয়, দুই –

শজারুর কাঁটা বসার আগে ছেঁটে ফেলা হয় এবং তিন – যদি পার্টি নির্দেশ দেয়।

□

স্তালিন ফোন করলেন রুজভেল্টকে :

– গমের সরবরাহ আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

– বন্দর–শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে। বেতন বাড়ানোর দাবি তাদের।

– কেন, আপনাদের দেশে কি পুলিশ নেই?

□

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গ্রহণের ইন্টারভিউ।

– তোমার মাতা কে?

– সোভিয়েত ইউনিয়ন।

– তোমার পিতা কে?

– আমাদের মহান নেতা – স্তালিন।

– তোমার সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কী?

– অচিরেই পুরোপুরি এতিম হয়ে যাওয়া।

□

নতুন গায়ক স্টেজে গান গাইতে ওঠার আগেই নিশ্চিত ছিলো নিজের সাফল্য সম্পর্কে। সে ভেবে রেখেছিল : *প্রথম গানের পরে হাততালি যদি বেশি না পড়ে, তাহলে গাইবো স্তালিনের ওপরে লেখা গান। দেখবো, হাততালি না দিয়ে পারে কেমনে ...*

এক অন্ধ আমেরিকান কোটিপতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দেখাশোনার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসরত তাঁর নাতিকে চিঠি লিখে প্রস্তাব দিলেন আমেরিকায় চলে আসার। নাতির ডাক পড়লো কেজিবি অফিসে। তাকে বলা হলো :

– তোমার দাদাকে চিঠি লিখে বলো, ব্যবসাপত্র সব গুটিয়ে টাকা–পয়সা সব এখানকার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি চলে আসুন এখানে। আর এখানে তাঁর যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সে–ব্যবস্থা করবো আমরা।

– আমার মনে হয়, আপনারা ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারেননি। আমার দাদার চোখই নষ্ট হয়েছে শুধু, মাথার ঘিলু কিন্তু আস্তই আছে।

□

দু'জন কয়েদির কথোপথন।

– আপনাকে ক'বছরের জেল দিয়েছে।

– কুড়ি বছরের।

– কী কারণে?

– এমনি। কোনো কারণ ছাড়াই।

– মিথ্যে কথা! কারণ ছাড়া হলে দেয় দশ বছরের জেল।

□

হাতি বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ হাতি বিষয়ে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচনা লিখে পাঠিয়েছে।

জার্মানি পাঠিয়েছে : *হাতি পালন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা* ।

ইংল্যান্ড : *হাতি এবং সাম্রাজ্য।*

আমেরিকা : হাতি এবং অর্থ।
ফ্রান্স : হাতি এবং প্রেম।
সোভিয়েত ইউনিয়ন : রাশিয়া – হাতির মাতৃভূমি।
বুলগেরিয়া : সোভিয়েত হাতি – বুলগেরীয় হাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু।
(স্তালিনের শাসনামলে বুলগেরিয়া খুব বেশি সোভিয়েত ইউনিয়ন–নির্ভর হয়ে পড়েছিল। এর পর থেকে বুলগেরিয়া বরাবরাই 'অতিশয় সোভিয়েত–বিশ্বস্ত' আখ্যা পেয়ে এসেছে।)

□

পোলিশ ভেলকি : পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত বার্লিনের কাছাকাছি, পূর্ব সীমান্ত ওয়ারশ'র কাছাকাছি, আর রাজধানী মস্কোয়।

□

– লেনিন পরতেন সাধারণ জুতো, স্তালিন পরেন উঁচু গামবুট। কেন?
–কারণ লেনিনের সময় দেশে মলের পরিমাণ ছিলো পায়ের পাতা অব্দি। আর স্তালিনের সময় তা অনেক বেড়েছে।

□

ট্রামের জন্য অপেক্ষমান দু'জনের কথোপকথন। প্রথমজন :
–পাউডার এবং সরকারের মধ্যে কী তফাত, আপনি জানেন?
–না।
–পাউডার মুখে মাখে, আর সরকারকে কেউ কোথাও ঠেকাতেও চায় না।
ট্রাম এসে পড়লো। এবারে প্রশ্ন করলো দ্বিতীয় জন :
–ট্রাম এবং আপনার মধ্যে পার্থক্য কী, আপনি জানেন?

–না।

–ট্রাম এখন চলে যাবে নিজের পথে, আর আপনি যাবেন আমার সাথে কেজিবি অফিসে।

–কিন্তু আমি তো সরকার বলতে আমেরিকান সরকারকে বোঝাতে চেয়েছি।

– চাপাবাজি রাখুন। যে–সরকারকে কোথাও ঠেকাতে ইচ্ছে হয় না, তা নির্ঘাত আমাদেরটা।

□

নৌবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেকোস্লাভাকিয়া। সোভিয়েত উপদেষ্টার কাছে এ–ব্যাপারে পরামর্শ চাইতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

– নৌবাহিনীর আপনাদের কী প্রয়োজন? আপনাদের তো সমুদ্র নেই !

– তাতে কী? আপনাদের দেশে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কেন আছে, তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি কখনও?

□

হুবহু স্তালিনের মতো দেখতে এক লোককে গ্রেফতার করে এনে স্তালিনের কাছে জানতে চাওয়া হলো, তাকে নিয়ে কী করা উচিত।

– গুলি করে মেরে ফেলে দাও, – বললেন স্তালিন।

– নাকি গোঁফ ছেঁটে দেবো?

– হ্যাঁ, তা–ও করা যেতে পারে।

□

স্তালিনের চুরুট হারিয়ে গেছে। তদন্ত শুরু হলো। সন্ধ্যে নাগাদ গ্রেফতার করা হলো শ'খানেক লোককে। ইতিমধ্যে ঝাড়ুদার চুরুটটি খুঁজে পেয়েছে

ডিভানের তলায়। স্তালিন ফোন করলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের :

– আর কষ্ট করতে হবে না। চুরুট খুঁজে পাওয়া গেছে।

– কিন্তু, স্যার, আমরা কী করি এখন? গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই আপনার চুরুট চুরি করেছে বলে স্বীকার করেছে।

–কী? একজন এখনও স্বীকার করেনি? চালিয়ে যান তদন্তকার্য।

□

জাদুঘরে স্তালিনের মায়ের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে এক লোক খুব বিমর্ষভাবে দু'পাশে মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো :

– কী সুন্দরী মহিলা ! কিন্তু সময়মতো কেন যে অ্যাবরশান করাননি।

□

আদালত–কক্ষ থেকে বের হয়েই দম ফাটিয়ে হেসে উঠলেন প্রধান বিচারপতি। সহকর্মীরা জানতে চাইলো, ব্যাপার কী।

–এতো হাসির এক চুটকি শুনলাম ! এইমাত্র একজনকে দশ বছরের জেল দিয়ে এলাম ওই চুটকি বলার দায়ে। কিন্তু এতো মজার চুটকি !

□

পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করছে :

–বাবা, এখন কি দেশে কমিউনিজম? নাকি অবস্থা আরো খারাপ হবে?

□

রাবিনোভিচ মারা যাবার পর তাকে নরকে পাঠানোর নির্দেশ হলো। প্রতিবাদ করলো সে :

– সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবন যাপনের পরেও কি স্বর্গে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না?

– যে–জীবন তুমি যাপন করে এসেছো ওখানে, তার পরে নরকই তোমার কাছে মনে হবে স্বর্গের মতো।

□

গ্রাম থেকে বুড়ি এসেছে ওয়ারশতে বেড়াতে। শহরের মাঝখানে স্তালিনের মূর্তি দেখে বুড়ি জানতে চাইলো, মূর্তিটি কার।

–এটা মহান স্তালিনের মূর্তি। নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে তিনিই আমাদের মুক্ত করেছেন।

– ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন,– বললো বুড়িটি। – কমিউনিস্টদের কবল থেকেও তিনি যদি আমাদের মুক্ত করতেন!

□

পোলিশ জনগণের দৃষ্টিতে পোলান্ড–সোভিয়েত বাণিজ্য : *আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়লা রপ্তানি করি, তার বদলে তারা আমাদের কাছ থেকে ইস্পাত নিয়ে যায়।*

□

–দেশলাই ফ্যাক্টরির ডিরেক্টর বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে, তা শুনেছেন?

– না তো ! কেন হঠাৎ?

– প্রতিবিপ্লবীরা সামরিক বিমানবন্দরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাদের কাছে ছিলো ওই ফ্যাক্টরির দেশলাই। বহু চেষ্টা করেও সেই দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালতে পারেনি তারা।

কেজিবির এক লোকের সাথে দেখা তার প্রতিবেশীর।

–শুভ সন্ধ্যা, – বললো প্রতিবেশী।

–সন্ধ্যা মানে? এই ভর দুপুরে বলছেন শুভ সন্ধ্যা?

–আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু কী করবো, বলুন? আপনাকে দেখলেই আমার চারপাশে সব অন্ধকার হয়ে আসে।

□

স্ত্রীর সাথে ট্রামে চড়ে যাচ্ছে রাবিনোভিচ। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে হঠাৎ। সবাই ঘুরে তাকালো তার দিকে। ভীত স্ত্রী বললো তাকে কানে কানে :

–কতোবার বলেছি তোমাকে, লোকজনের সামনে রাজনীতি বিষয়ে টুঁ শব্দটিও করবে না !

□

বড়শিতে মাছ ধরছে এক লোক। টোকা পড়লো ফাতনায়। টেনে তুলে দেখলো সে – সোনালি মাছ। খুব অনুনয়–বিনয় করে মাছটি বললো :

– আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার যে–কোনো ইচ্ছে আমি পূরণ করবো।

– ঠিক আছে, সব কমিউনিস্টকে কফিনে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

–সব কমিউনিস্টকে? তাদের মধ্যে তো অনেক ভালো লোকও আছে।

–তাহলে ভালো কমিউনিস্টদের ভালো কফিনে ভরো, আর খারাপ কমিউনিস্টদের – খারাপ কফিনে।

□

– ইলেকট্রিক শেভিং রেজর কে আবিষ্কার করেন?

– ইভান সিদোরভ। তিনি তা আবিষ্কার করেন আমেরিকান দূতাবাসের পার্শ্ববর্তী ডাস্টবিনে।

১৯৪৭ সালে মুদ্রা সংস্কারের পর এক বস্তা টাকা নিয়ে এক কৃষক এলো শহরে। রাস্তার পাশে বস্তাটি রাখলো সে, তারপর জানতে গেল পুরনো টাকার বদলে নতুন টাকা কোথায় দিচ্ছে। ফিরে এসে দেখলো সে, তার সব টাকা গড়াগড়ি যাচ্ছে রাস্তায়, আর বস্তাটি গায়েব।

(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুবলের মূল্যমান ভয়ঙ্করভাবে কমে এলে স্তালিন ১৯৪৭ সালে মুদ্রা সংস্কারের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন)

□

বেশ জোরেসোরেই বললো রাবিনোভিচ :

– শালার অভিশপ্ত জীবন!

সাদা পোশাকধারী কেজিবি এসে বললো তাকে :

– আমার সাথে যেতে হবে আপনাকে।

– আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। বলছিলাম পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর অভিশপ্ত জীবনের কথা।

–আপনি বললেন আর আমি বিশ্বাস করলাম? অভিশপ্ত জীবন কোথায়, তা ভালো করেই আমাদের জানা আছে। চলুন আমার সাথে।

□

দু'জনের কথোপকথন।

– শ্রমশিবির নাকি দারুণ জায়গা? লোকজন নাকি খুব ভালো থাকে ওখানে?

– মনে হয় তা–ই। কারণ আমার এক পরিচিত ব্যক্তি এ–ব্যাপারে

সন্দেহ প্রকাশ করায় স্বচক্ষে দেখানোর জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। সেই যে গেছে, আজও ফেরেনি। মনে হয়, খুব পছন্দ হয়েছে শ্রমশিবির।

□

রাবিনোভিচ প্রশ্ন করলো তার বুন্ধকে :

– স্তালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কতো খরচ হলো?

–এক মিলিয়ন রুবল।

–ওই টাকা দিয়ে গোটা সরকারকে কবর দিতে পারতাম আমি।

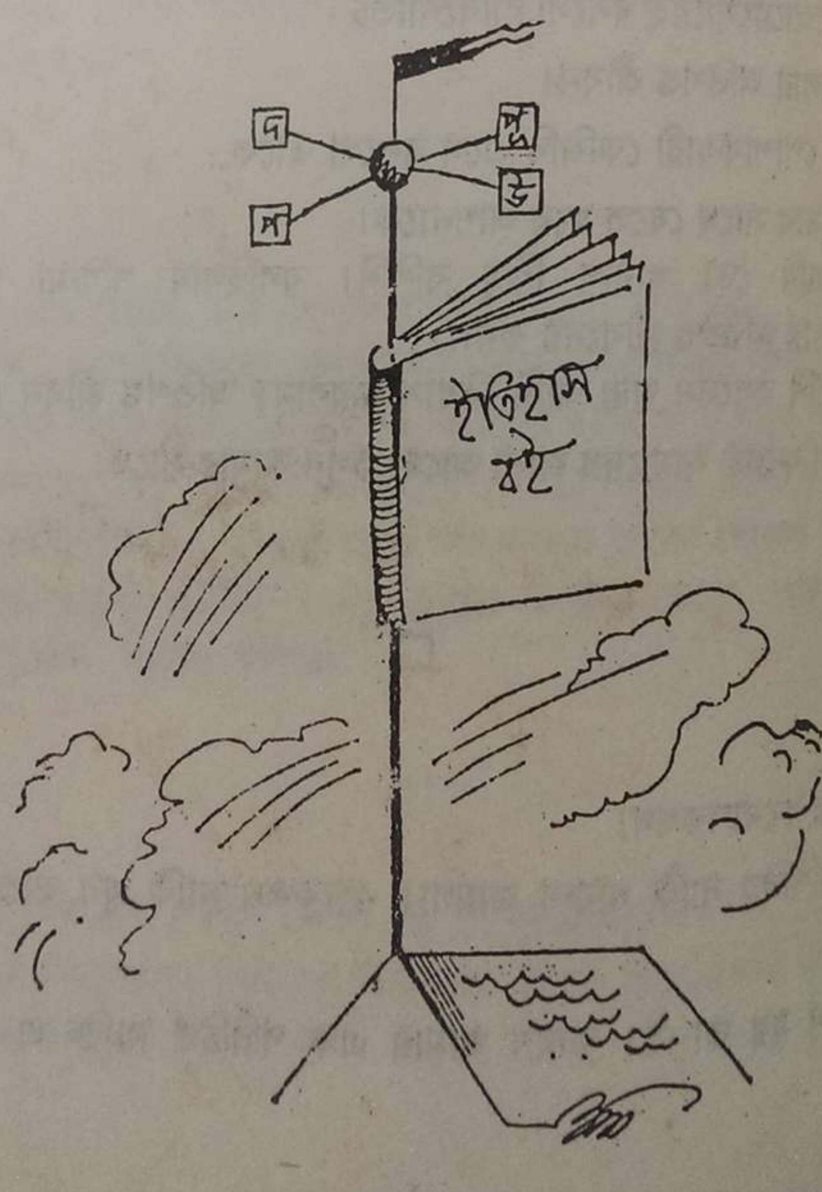

ক্রুশ্চেভ পর্ব
(১৯৫৩–১৯৬৪)

বেশ কিছু কৌতুক ক্রুশ্চেভকে (রুশ উচ্চারণে - খ্রুশ্যভ) চিত্রিত করেছে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। দেশের কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে তিনি একবার উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। ফল হয়েছিল বিপরীত।

কৌতুক রচয়িতা এবং পরিবেশনকারীকে শ্রমশিবির বা কারাগারে পাঠানোর স্তালিনীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন তিনি।

তাঁকে কুৎসিত এবং কদাকার চেহারার ব্যক্তি বলে মনে করতো সোভিয়েতরা।

নভোযান 'ভসখোদ-১' — এর উৎক্ষেপণ এবং ক্রুশ্চেভের মৃত্যু - এই দুই ঘটনা ঘটেছিল খুব কাছাকাছি সময়ে।

দাদীকে নাতির প্রশ্ন :

– লেনিন কি ভালো ছিলেন?

– হ্যাঁ, খুব ভালো ছিলেন।

– আর স্তালিন ছিলেন খুব খারাপ, তাই না?

– হ্যাঁ।

– আর ক্রুশ্চেভ কেমন?

–এখনও জানি না। মরুক আগে, তারপর জানা যাবে।

□

আলেক্সান্দর মাকেদোন্স্কি, জুলিয়াস সীজার এবং নেপোলিয়ন সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর শোভাযাত্রা দেখছেন রেড স্কোয়্যারে। মাকেদোন্স্কি বললেন:

– এ-রকম সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আমার থাকলে কেউ জিততে পারতো না আমার সঙ্গে।

– আমার কাছে সোভিয়েত বোমারু বিমান থাকলে গোটা দুনিয়া জয় করে নিতাম আমি, – বললেন জুলিয়াস সীজার।

– আর আমার যদি একটি পত্রিকা থাকতো প্রাভদার মতো, – বললেন নেপোলিয়ন, – ওয়াটারলুতে আমার পরাজয়ের কথা বিশ্ব আজও জানতে পারতো না।

বুড়ো বলশেভিক বলছে আরেকজনকে :

– কমিউনিজম পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না, কিন্তু দুঃখ হয় ছেলে-মেয়েদের জন্য।

□

নিজের ছবি সম্বলিত ডাকটিকেট বের করার নির্দেশ দিলেন ক্রুশ্চেভ। কিছুদিন পরে ডেকে পাঠালেন ডাক ও তার মন্ত্রীকে, জানতে চাইলেন কেমন বিক্রি হচ্ছে ডাকটিকেটটি।

– বিক্রি হচ্ছে না একেবারেই।

– কেন?

– টিকেট নাকি খামে সাঁটা যাচ্ছে না।

– কেন, টিকেটে কি আঠা লাগানো নেই?

– তা আছে। তবে লোকজন, মনে হয়, আঠা-লাগানোর দিকে থুতু দিচ্ছে না। দিচ্ছে উল্টোদিকে, যে-পাশে ছবি।

□

ভেবে নেয়া যাক, দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা অকস্মাৎ নির্জন কোনো দ্বীপে গিয়ে পড়লো। এই অবস্থায় কোন জাতির আচরণ কেমন হবে?

ইংরেজ দুই পুরুষ মহিলাটির জন্য ডুয়েল লড়বে।

আমেরিকানরা বাধিয়ে দেবে ধুন্ধুমার লড়াই।

ফরাসীরা তিনজন একত্রে বসবাস শুরু করবে।

রুশরা গড়ে নেবে যৌথ খামার। একজন পুরুষ হবে খামারের ডিরেক্টর, অন্যজন – পার্টির খামার শাখার সেক্রেটারি, আর মাঠে কাজ করবে মহিলাটি।

বুলগেরীয়রা মস্কোয় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণমূলক নির্দেশের অপেক্ষা করবে।

□

একটি জরিপের প্রশ্ন : *কী পত্রিকা পড়েন এবং কেমন আছেন?*

একজনের উত্তর : পড়ি প্রাভদা, নইলে ভালো আছি জানবো কি করে?

□

আমেরিকান রুশকে বললো গর্বের সঙ্গে ঃ

– আমাদের ওখানে পুরোপুরি স্বাধীনতা। ইচ্ছে করলেই আমি হোয়াইট হাউসের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে পারি – *আইজেনহাওয়ার নিপাত যাক* ।

–এতে গর্ব করার কী আছে? – অবাক হয়ে বললো রুশ। – আমিও যখন – তখন রেড স্কোয়্যারে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বলতে পারি - *আইজেনহাওয়ার নিপাত যাক* ।

□

সরকারের ধামাধরা লেখক করনেইচুক সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। ডাক্তার এলে তাঁকে জানানো হলো, করনেইচুকের মেরুদন্ড ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘোর প্রতিবাদের সুরে ডাক্তার বললেন :

–এটা অসম্ভব। আমি তাঁকে চিনি বহু বছর ধরে। তাঁর মেরুদন্ডই নেই।

শুয়োরের ফার্ম দেখতে গেলেন ক্রুশ্চেভ, ছবি তোলা হলো তাঁর। কিন্তু ছবির ক্যাপশন কী হবে, তা নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়লো সাংবাদিকরা।

– শুয়োরদের মাঝখানে কমরেড ক্রুশ্চেভ কেমন হয়?

–চলবে না।

– শুয়োর পরিবেষ্টিত কমরেড ক্রুশ্চেভ?

– না, এটাও চলবে না।

পরদিন পত্রিকা বেরুলে দেখা গেল, ছবির নিচে ক্যাপশান : *কমরেড ক্রুশ্চেভ – বাম থেকে তৃতীয়* ।

□

গো-খাদ্যের প্রচন্ড আকাল দেখা দেয়ায় বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি অনুযায়ী জিরাফের সাথে গাভীর সঙ্কর তৈরি করা হলো। উদ্দেশ্য – খাদ্যের জন্য লম্বা গলা বাড়িয়ে দেবে সে ইওরোপে, আর দুধ দেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে।

□

হারিয়ে যাওয়া বালককে আশ্বস্ত করছে মিলিশিয়া :

–চিন্তা করো না, তোমার হারিয়ে যাওয়ার খবর আমরা রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করবো। তারপর তোমার বাবা–মা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

– তাহলে প্রচারটা বিবিসি–র মাধ্যমে করুন, – বালকটি বললো।

– আমার বাবা–মা আবার বিবিসি ছাড়া অন্য কিছু শোনে না।

□

রাজনৈতিক কৌতুক–রচয়িতাকে ধরে নিয়ে আসা হলো ক্রুশ্চেভের কাছে। সে অবাক চোখে দেখতে লাগলো চারদিক এবং বললো :

– কী দারুণ সব আসবাবপত্র! কী দামি কার্পেট!

ক্রুশ্চেভ বললেন :

– অচিরেই আমাদের দেশের প্রত্যেকের ঘরে এসব থাকবে।

– কমরেড ক্রুশ্চেভ, তা হয় না। হয় শুধু আপনি চুটকি বলবেন, নয়তো শুধু আমি।

□

আমেরিকায় আইজেনহাওয়ার এবং ক্রুশ্চেভ গাড়িতে চড়ে ঘুরছেন। হঠাৎ পিছু লাগলো রেড ইন্ডিয়ানরা। শুরু করলো তীর ছুঁড়তে। সম্মানিত অতিথির সম্মান রক্ষার খাতিরে রেড ইন্ডিয়ানদের দাবি অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ–সুবিধে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইজেনহাওয়ার একটি চিরকুট লিখে ছুঁড়ে দিলেন তাদের দিকে। চিরকুটটি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে ধাওয়া অব্যাহত রাখলো রেড ইন্ডিয়ানরা। এরপর কী একটা লিখে চিরকুট ছুঁড়ে দিলেন ক্রুশ্চেভ। চিরকুটটি পড়েই তারা উল্টোদিকে ছুট লাগালো তীরবেগে। বিস্মিত আইজেনহাওয়ার প্রশ্ন করলেন ক্রুশ্চেভকে, এমন কী তিনি লিখেছিলেন চিরকুটে, যা তাদের এমন ভীতির উদ্রেক করলো। নির্বিকার ক্রুশ্চেভ উত্তর দিলেন :

–লিখেছিলাম, *আমরা কমিউনিজমের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি* ।

□ :D

গোপনীয়তার রকমফের।

ফ্রান্সের এক কারখানার কর্মচারী জানে না, তাদের কোম্পানির অন্য কারখানা কী উৎপাদন করে।

ইংল্যান্ডের এক ল্যাবরেটরির কর্মচারী জানে না, অন্য ল্যাবরেটরির কর্মচারীরা কী করে।

আমেরিকার এক কর্মচারী জানে না, তারই অফিসে তার পাশের টেবিলের কর্মচারী কী করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে একজন কর্মচারী কী করে, তা সে নিজেই জানে না।

□

– চীনে বেড়ালদের মেরে ফেলা হচ্ছে কেন?

–কারণ তারা মাও না বরে বলছে 'ম্যাও'।

□

যৌথ খামার দেখতে গিয়ে হঠাৎ গভীর এক গর্তে পড়ে গেলেন ক্রুশ্চেভ। একজন কৃষক তাঁকে টেনে তুললো গর্ত থেকে। ক্রুশ্চেভ কৃষককে বললেন:

– আমি যে গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম, সেটা দয়া করে কাউকে বলবেন না। ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে তাহলে।

– তা বলবো না। কিন্তু আপনিও ভুলেও কাউকে বলবেন না যে আমিই আপনাকে গর্ত থেকে তুলে বাঁচিয়েছি। আমাকে তাহলে আস্ত রাখবে না কেউ।

□

ক্রুশ্চেভকে ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতো বলা হলো। আপত্তি জানালেন তিনি, বললেন :

– আমি তো এ–ব্যাপারে কিছু জানি না, বুঝিও না।

– তাতে কী? না জেনে, না বুঝে কৃষি নিয়ে আপনি একসময় মেতেছিলেন খুব। ফল হলো কী? দেশ থেকে শস্য গেল উধাও হয়ে। তো এখন একটু এটা নিয়ে মাতুন, হয়তো ক্যান্সার দূর হয়ে যাবে।

ফিদেল কাস্ত্রোকে স্টিয়ারিংবিহীন নতুন গাড়ি উপহার দিলেন ক্রুশ্চেভ। অচিরেই কাস্ত্রো টেলিগ্রাম পাঠালেন মস্কোয় : *স্টিয়ারিং–এর অভাবে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না। দয়া করে স্টিয়ারিং পাঠান ।*

ক্রুশ্চেভ উত্তর দিলেন : *গাড়িতে বসে আপনি এক্সিলেটরে চাপ দিন, আর স্টিয়ারিং ঘোরাবো আমি এখান থেকে ।*

□

উপায়ান্তর না দেখে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলো আমেরিকান স্পাই। গেল সে কেজিবি অফিসের এক নম্বর কক্ষে। বললো :

– আমি এসেছি অকপটভাবে নিজের দোষ স্বীকার করতে।

– অকপট স্বীকারোক্তি ১৩৮ নম্বর ঘরে। ...

– আমাকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে।

– গোয়েন্দা বিষয়ে কথা থাকলে যান ২২৭ নম্বর ঘরে। ...

– আমাকে এদেশে পাঠানো হয়েছিল স্পাই হিসেবে।

– কিসে চড়ে এসেছিলেন?

– জাহাজে।

– জলভাগ নিয়ে ডীল করে ৩৬৮ নম্বর ঘরে। ...

– আমাকে এদেশে পাঠানো হয়েছিল জাহাজে করে।

– সাধারণ জাহাজে নাকি ডুবোজাহাজে?

– ডুবোজাহাজে।

– ডুবোজাহাজ বিষয়ে কথাবার্তা ৭৯৪ নম্বর ঘরে ...

– আমাকে ডুবোজাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল এদেশে।

– সরাসরি বলুন, আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নাকি দেয়া হয়নি এখনও?

– হ্যাঁ, আমাকে বিশেষ একটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

– তাহলে আর খামোখা জ্বালাতন করছেন কেন সবাইকে? দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, পালন করুন।

সাম্প্রতিক ধাঁধা।

– সবচেয়ে উদ্ভাবনীক্ষমতাসম্পন্ন জাদুকর কে?

– ক্রুশ্চেভ। গম বোনেন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং শস্য তোলেন কানাডায়।

(দেশের কৃষি নিয়ে ক্রুশ্চেভের ব্যাপক তৎপরতা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কানাডা থেকে গম আমদানী করতে হয়েছিল সেই সময়)

□

মাও সে-তুং টেলিগ্রাম পাঠালেন ক্রুশ্চেভকে : *চীনে দুর্ভিক্ষ। দয়া করে খাদ্যদ্রব্য পাঠান।*

ক্রুশ্চেভ উত্তর দিলেন : *আমাদের নিজেদের অবস্থাও সংকটময়। তাই কোনো খাদ্যদ্রব্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। পেটে পাথর বাঁধুন।*

মাও সে-তুং এর ফিরতি টেলিগ্রাম : *জরুরি ভিত্তিতে পাথর পাঠান।*

□

ঘরে একটি চেয়ার, চেয়ারের ঠিক মাঝখানে পেরেকের ছুঁচলো দিকটি উঁচু হয়ে আছে।

ইংরেজ ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে ঢুকলো ফরাসী, বসলো চেয়ারে তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

রুশ ঘরে ঢুকলো, চেয়ারে বসলো। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে বসে রইলো।

এরপরে ঘরে ঢুকলো বুলগেরিয়ান, সঙ্গে নিয়ে এলো আরেকটি চেয়ার, পেরেক গাঁথলো তাতে। তারপর বসে রইলো রুশটির পাশে।

মাছের দোকানে ক্রেতা।

– আমাকে ওই রাষ্ট্রনায়ক–মাছটি দিন।

– রাষ্ট্রনায়ক–মাছ মানে?

– ওই যে ওই মোটাসোটা, চর্বিওয়ালা, মাথাবিহীন মাছটা।

□

ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ঘোষণা করলেন :

– এতো দারিদ্র্য আর কোথাও দেখিনি। দোকান জিনিসপত্রে ঠাসা, কিন্তু কোনো লাইন নেই। লোকজনের হাতে টাকা থাকলে তো!

□

আফ্রিকান এবং সোভিয়েত দুই স্কুলবালকের পত্রমিতালী। আফ্রিকান স্কুলবালক লিখলো : আমি পড়ি ক্লাস থ্রীতে। আমাদের এখানে খুব গরম, তাই খালি গায়ে ঘোরাফেরা করি। আমরা খাই কলা, আনারস, কমলা। তোমাকে দু'টো ডাকটিকেট পাঠাচ্ছি।

সোভিয়েত স্কুলবালকের উত্তর : ডাকটিকেটের জন্য ধন্যবাদ। আমাদের এখানে খুব ঠাণ্ডা, তাই গরম কাপড় পরতে হয়। বাবা বলেছে, আমরা যদি কলা, আনারস আর কমলা খেতে শুরু করি, তাহলে আমাদেরও খালি গায়ে ঘুরতে হবে।

□

শিক্ষক বললেন :

– কমিউনিজম ইতিমধ্যে দিগন্তে পৌঁছে গেছে।

– দিগন্ত মানে কী, স্যার ?

– দিগন্ত হলো একটা কাল্পনিক রেখা, যেখানে ভূমি মিশে যায় আকাশের সাথে। আর দিগন্তের দিকে যতো এগোনো যায়, ততো বেশি তা দূরে সরে যেতে থাকে।

□

– ক্রুশ্চেভ এবং নভোযান ভস্‌খোদ–১ –এর মধ্যে মিল কোথায়?
– দু'টোই উড়াল দিয়েছে একসঙ্গে।

ব্রেঝনেভ পর্ব
(১৯৬৪–১৯৮২)

তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো খুব দুর্বল এবং কোনো কথাই তিনি বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারতেন না – ব্রেঝনেভ সম্পর্কে এই বিশ্বাসটি কেন জানি অতিশয় দৃঢ় ছিলো সোভিয়েত জনগণের মনে। তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো – স্ক্রিপ্ট ছাড়া বক্তৃতা দিতেন না, এমনকি অতি-সাধারণ গৎ-বাঁধা অভিবাদন বাণী কিংবা সম্ভাষণ বাণীও তিনি পড়তেন স্ক্রিপ্ট দেখে।

বন্ধুদেশ হিসেবে কথিত চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের উদারনৈতিক মনোভাব ক্রমশ প্রকটতর হয়ে ওঠার কারণে ১৯৬৮ সালে ট্যাঙ্কসজ্জিত সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করে সে-দেশে। এমন ঘটনা এটাই প্রথম ছিলো না। ১৯৫৬ সালে আরেক 'বন্ধুদেশ' হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন প্রতিহত করতে ট্যাঙ্কসজ্জিত সোভিয়েত সেনাবাহিনী বড়ো ভূমিকা রেখেছিল।

সোশ্যালিস্ট, ক্যাপিটালিস্ট এবং কমিউনিস্টের এক জায়গায় দেখা করার কথা। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এলো সোশ্যালিস্ট, বললো :

– মাংসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম বলে আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি খুব দুঃখিত।

– লাইন ? সেটা আবার কী? – প্রশ্ন করলো ক্যাপিটালিস্ট।

– মাংস? সেটা আবার কী? – প্রশ্ন করলো কমিউনিস্ট।

□

মেডিক্যাল কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষা। দু'টো কঙ্কাল দেখিয়ে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন ছাত্রকে :

– এগুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো, বলো।

ছাত্র নিরুত্তর।

– মনে হচ্ছে, কিছু জানো না। কী পড়িয়েছে তোমাদের এই ছয় বছর?

– তার মানে, কঙ্কাল দু'টো মার্কস আর লেনিনের ?

□

রূপকথার জিন মিশরের শাসক নাসের, ব্রেঝনেভ এবং ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের একটি করে আদেশ পালনে সম্মত হলো। নাসের বললেন :

– সব কমিউনিস্টকে মেরে ফেলো। যত্তোসব বিশ্বাসঘাতকের দল। কতোদিন ধরে যুদ্ধ করছি ইজরাইলের সঙ্গে, কিন্তু সবই ব্যর্থ। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে ব্যাটারা।

ব্রেঝনেভ আদেশ দিলেন :

– আরবীয়দের ধরে গলা টিপে মেরে ফেলো। যতোই সাহায্য করি না কেন, তবু বন্য নেকড়ের মতো তাকিয়ে থাকে পশ্চিমের দিকে।

গোভামেয়ার বললেন :

– প্রথম দুজনের আদেশ পালন করে আমার জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এসো।

□

ক্যান্টনমেন্টের গোলন্দাজ বিভাগে বিরাট এক ব্যানার। তাতে লেখা : *আমাদের লক্ষ্য – কমিউনিজম।*

(ওদেসা শহরের গোলন্দাজ প্রশিক্ষণ কলেজে এক সময় এরকম ব্যানার সত্যিই ছিলো)

□

পোপ পলকে জিজ্ঞেস করলে ব্রেঝনেভ :

– সাধারণ লোক ক্যাথলিক স্বর্গে বিশ্বাস করে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক স্বর্গে বিশ্বাস করতে এতো অনীহা কেন তাদের?

–কারণ আমরা আমাদের স্বর্গ কাউকে দেখাই না।

□

ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখলে কোন দেশের পুরুষের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়?

ইংরেজ :

– লেডি, তোমাকে আমি অবিলম্বে আমার বাসা ত্যাগ করতে অনুরোধ করছি।

ফরাসী :

– অসময়ে এসে পড়ার জন্য আমি দুঃখিত, মঁসিয়ে।

রুশ :

– হারামজাদী ! ওই মোড়ের দোকানে মাখন বিক্রি হচ্ছে, আর তুই এখানে শুয়ে মজা মারছিস?

নিউজ স্টলে এক লোক প্রতিদিন প্রাভদার প্রথম পৃষ্ঠা দেখে রেখে দেয়। কৌতূহল দমন করতে না পেরে বিক্রেতা একদিন জিজ্ঞেস করে বসলো :

– প্রতিদিন আপনি কী খোঁজেন প্রথম পৃষ্ঠায়?

– মৃত্যুসংবাদ।

– কিন্তু মৃত্যুসংবাদ তো শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

– আমি যার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি, তার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হবে প্রথম পৃষ্ঠায়।

□

বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্ন ব্রেঝনেভকে :

– কমরেড লিওনিদ ইলিচ, দেশ চলছে কমিউনিজমের পথ ধরে, অথচ লোকজন খেতে পাচ্ছে না। এটা কী ধরনের ব্যাপার?

– পথের মাঝখানে খাওয়া-দাওয়া করে কোন গর্দভ? আগে পৌঁছে নিই, তারপর খাবো পেট পুরে।

□

রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার সমাবেশ। বক্তা বলছেন :

– সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা নিউট্রন বোমা মেরে আমাদের উড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। ওই বোমা বিস্ফোরিত হলে সব মানুষ মারা যাবে, তবে বাকি সবকিছু আস্ত থাকবে।

একজন শ্রোতার প্রশ্ন :

– আপনি কি বলতে পারেন, আমাদের দেশে কেমন বোমা বিস্ফোরিত হলো যে আমরা আস্ত আছি, অথচ দোকানপাট থেকে সবকিছু উধাও?

সোফিয়া লরেন এসেছেন ব্রেঝনেভের সঙ্গে দেখা করতে। ব্রেঝনেভ বললেন :

– আপনার যে-কোনো ইচ্ছে পূরণ করতে আমি প্রস্তুত।

– এদেশ ছেড়ে যারা চলে যেতে চায়, তাদের যাবার অনুমতি দিন।

– আপনি সতিই চান, আমরা দু'জন – শুধু দু'জন – থাকি এই দেশে?

□

ব্রেঝনেভ প্রশ্ন করলেন কোসিগিনকে :

– আমাদের দেশে কতোজন ইহুদি?

– পঁচিশ লাখ।

– যদি এদেশ ছেড়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয় ইহুদিদের, তাহলে কতোজন যাবো বলে মনে হয়?

– এক থেকে দেড় কোটি।

□

ইয়াসির আরাফাতকে বিদায় দিয়ে মস্কো এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে ব্রেঝনেভ হাত নেড়েই চলেছেন উড়ন্ত প্লেনের উদ্দেশে। ব্রেঝনেভের সহকারী বললেন :

– কমরেড ব্রেঝনেভ, আর হাত নেড়ে কী হবে? প্লেন তো টেক অফ করেছে অনেক আগেই।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো ব্রেঝনেভ বললেন :

– রাজনীতিবিদ হিসেবে সে এমন কিছু নয় বটে, কিন্তু চুমো খেতে পারে দারুণ!

ব্যাপক প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও কিছু লোক গির্জায় যাওয়া বন্ধ করছে না দেখে ব্রেঝনেভের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অনেক পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে গেছে তাঁর। একবার বিদেশ ভ্রমণের প্রাক্কালে তিনি কোসিগিনকে এ–ব্যাপারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ব্রেঝনেভ হতবাক। একজন লোকও গির্জায় যায় না। এই অসম্ভব কাজটি এতো অনায়সে কী করে করা সম্ভব হলো, তা কোসিগিনকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন :

– তেমন বেশি কিছু করিনি, শুধু গির্জাগুলোয় যীশুখ্রীষ্টের ছবি সরিয়ে আপনার ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি।

□

নভোচারীর ফ্লাটে টেলিফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরলো নভোচারীর মেয়ে :

– বাবা এখন ঘরে নেই। মহাশূন্য থেকে ফিরবে দু'ঘন্টা পরে। মা–ও নেই ঘরে। লাইনে দাঁড়িয়েছে আলুর জন্য। ফিরতে দেরি হবে। অন্তত ঘন্টা তিন–চারেক তো বটেই।

□

ফ্রেমে বাঁধানো লেনিনের প্রতিকৃতি সঙ্গে নিয়ে ইজরাইল যাচ্ছে সোভিয়েত ইহুদি। মস্কো এয়ারপোর্টের কাস্টমস অফিসার জিজ্ঞেস করলো তাকে :

– এটা কী?

– কী নয়, কে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

ইজরাইল এয়ারপোর্টের কাস্টমস অফিসার :

– এটা কে?

– কে নয়, কী। সোনার ফ্রেম।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত প্রতিযোগী নতুন বিশ্বরেকর্ড করে প্রথম হলো হাতুড়ি নিক্ষেপে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো তাকে :

– হাতুড়ি এতো দূরে কী করে ছুঁড়ে ফেলতে পারলেন?

– এ আর এমন কী! কাস্তে–হাতুড়ি একত্রে এনে দিন না, আরো দূরে ছুঁড়ে ফেলবো।

□

সোভিয়েত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের নেতা দেখলেন, একজন কর্মচারীও নির্দিষ্ট স্থানে বসে নেই। কেউ কেউ গল্প করছে গোল হয়ে বসে, কৌতুক বলছে পরস্পরকে, সিগারেট ফুঁকছে কেউ, জানালার কোণে বসে দাবা খেলছে দু'জন, একজন মহিলা তার সদ্য কেনা সোয়েটার দেখাচ্ছে অন্যজনকে। পরিদর্শন শেষে ফিরে যাবার সময় নেতাটি বললেন :

– সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হলো এই গবেষণা কেন্দ্রের কর্মচারিদের কর্মবিরতিকে সমর্থন জানাতাম।

□

– মিনি স্কার্ট কী?

– ছোট স্কার্ট।

– মিনি কম্পিউটার কী?

– ছোট কম্পিউটার।

– সবচেয়ে বড়ো বিশৃঙ্খলার নাম তাহলে *মিনিস্ট্রি* কেন?

পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলরের সঙ্গে ব্রেঝনেভের সাক্ষাতের পর তাঁকে খুব বাহবা দিলেন তাঁর সহকারী :

– চ্যান্সেলরকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে পেরেছেন আপনি! ব্যাটা বুঝেছে, কতো ধানে কতো চাল। ওই যে আপনাকে জিজ্ঞেস করলো, *ইওরোপের দূরপাল্লার রকেটগুলো নিয়ে কিছু ভেবেছেন* ? আর আপনি বললেন, কিসের রকেট ? খুব বাঁশ খেয়েছে ব্যাটা চ্যান্সেলর।

ব্রেঝনেভ জিজ্ঞেস করলেন :

– কোন চ্যান্সেলর?

□

প্রোপাগান্ডার ক্লাস।

– প্রয়োজন হলে আমাদের জনগণ সাধারণ স্যুটকেসে ভরে বোমা নিয়ে যাবে শত্রুর শহরে...

একজনের প্রশ্ন :

– সবাইকে একটা করে বোমা দিতে পারবেন, তা জানি। কিন্তু অতো স্যুটকেস পাবেন কোথায়?

□

একজন ইহুদিকে প্রশ্ন করা হলো, জাতি হিসেবে ইহুদিরা অতো আশাবাদী কেন?

– ইতিহাস আমাদের বাধ্য করেছে আশাবাদী হতে।

– কেন, আপনাদের ইতিহাস কি খুব দুঃখময়?

– না, তা কেন! মিশরের ফারাওরা যখন ছিলো, ইহুদিরাও ছিলো তখন। ফারাওরা নেই, ইহুদিরা আছে।

ছিলো প্রাচীন গ্রীকরা, ছিলো ইহুদিরা। সেই গ্রীকরা নেই, ইহুদিরা আছে।

ছিলো জার, ছিলো ইহুদিরা। জার নেই, ইহুদিরা আছে।
হিটলার ছিলো, ইহুদিরা ছিলো। হিটলার নেই, ইহুদিরা আছে।
স্তালিন ছিলো, ইহুদিরা ছিলো। স্তালিন নেই, ইহুদিরা আছে।
নাসের ছিলো, ইহুদিরা ছিলো। নাসের নেই, ইহুদিরা আছে।
এখন আছে কমিউনিস্টরা, আছে ইহুদিরাও।

– আপনি কি কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন?

– মোটেও না। শুধু বলতে চাই, আমরা ফাইনালে উঠেছে।

□

পুত্রের প্রশ্ন পিতাকে :

– বাবা, মোরগ ডাকে কেন?

– কেউ মিথ্যে কথা বললেই মোরগ ডেকে ওঠে।

– কিন্তু ভোর চারটেয়, সবাই যখন ঘুমে, মোরগ কেন ডাকে?

– ওই সময় দৈনিক পত্রিকাগুলো ছাপা হয়, তাই।

□

একজন ইহুদি অনুমতি পেলো বিদেশ ভ্রমণের। বিদেশ থেকে সে টেলিগ্রাম পাঠাতে শুরু করলো।

স্বাধীন বুলগোরিয়া থেকে শুভেচ্ছা । –রাবিনোভিচ।

স্বাধীন রুমানিয়া থেকে শুভেচ্ছা । – রাবিনোভিচ।

স্বাধীন হাঙ্গেরি থেকে শুভেচ্ছা । – রাবিনোভিচ।

অস্ট্রিয়া থেকে শুভেচ্ছা । – স্বাধীন রাবিনোভিচ।

রাজনীতিশিক্ষা ক্লাসে বক্তা বললেন :

– সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে ব্যবসা করে খুব লাভবান হচ্ছে।

একজনের প্রশ্ন :

– একটি উদাহরণ দিয়ে বলবেন কি?

– এই যেমন রুমানিয়া মাটি পাঠায় আমাদের। সেই মাটি দিয়ে খেলনা হুইসেল বানিয়ে আমরা পাঠাই মঙ্গোলিয়া। ওখানকার রাখালরা ভেড়া চড়ায় ওই হুইসেল বাজিয়ে।

– তারপর ভেড়ার মাংস আর চামড়া মঙ্গোলিয়া আমাদের পাঠায়?

– না, মাংস তারা নিজেরা খায়, আর চামড়া পাঠায় বুলগেরিয়ায়। সেই চামড়া দিয়ে বুলগেরিয়া বানায় গরম কোট।

– ওই কোটগুলো পরে বুলগেরিয়া আমাদের পাঠায়?

– না, রুমানিয়ায়।

– আর রুমানিয়া থেকে আমরা কী পাই?

– ওই যে শুরুতে বললাম – মাটি।

□

১৯৭০ সালে ভয়ঙ্কর বন্যায় রুমানিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে সাহায্য হিসেবে আমেরিকা পাঠালো দু'মিলিয়ন ডলার, পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাঠালো চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন – *সাঁতার শিক্ষা পদ্ধতি* নামক শিক্ষামূলক পুস্তক।

□

মস্কো অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা পড়তে শুরু করলেন ব্রেঝনেভ :

– ও, ও, ও...

পাশ থেকে তাঁর সহকারী তড়িঘড়ি করে বললেন :

– কমরেড ব্রেঝনেভ, ওগুলো অলিম্পিক রিং, ও অক্ষর নয়।

□

ইজরাইল গমনেচ্ছু ইহুদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে :

– আপনার কোনো আত্মীয় আছে বিদেশে?

– না।

– মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনার চাচা থাকেন ইজরাইলে, তা আমাদের জানা আছে।

– এটা আমি পড়ে আছি বিদেশে, আমার চাচা নয়।

□

ইথিওপিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ফান্ডে সাহায্য করার জন্য স্কুলের ছাত্রদের দশ রুবল করে আনতে বলা হলো। একজন এলো টাকা ছাড়া। বললো :

– বাবা বলেছে, ইথিওপিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি নেই।

এক মাস পরে ইথিওপিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সাহায্য করার জন্য আবার দশ রুবল করে আনতে বলা হলো স্কুলের ছাত্রদের। সেই বালক আবার এলো টাকা ছাড়া। বললো :

– বাবা বলেছে, ইথিওপিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার নেই।

কিছুদিন পরে আরো দশ রুবল চাওয়া হলো ইথিওপিয়ার অনাহারী জনগণের জন্য। সেই বালক এবার নিয়ে এলো তিরিশ রুবল। বললো :

– বাবা বলেছে, ইথিওপিয়ায় যদি অনাহারী থাকে, তার মানে ওখানে কমিউনিস্ট পার্টি তো আছেই, আছে সমাজতান্ত্রিক সরকারও।

আমেরিকান গল্প করছে রুশকে :

– আমার তিনটে গাড়ি। একটাতে চড়ে যাই কাজে, অন্যটাতে চড়ে বেড়াতে যাই। আর ইওরোপে যাই তৃতীয়টাতে চড়ে।

উত্তরে রুশ বললো :

– আমি কাজে যাই ট্রামে চড়ে, বেড়াতে যাই টিউব রেলওয়েতে।

– আর ইওরোপে?

– ইওরোপে যাই ট্যাঙ্কে চড়ে।

(এটি এবং পরবর্তী আটটি কৌতুক ১৯৬৮ সালে চেকোস্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত)

□

শিক্ষকের প্রশ্ন ছাত্রকে :

– বিকৃত ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।

– সোভিয়েত–চেক ভালোবাসা।

□

দু'জন চেক নাগরিকের কথোপকথন।

– সোভিয়েতরা আমাদের কে – বন্ধু না ভাই?

– অবশ্যই ভাই। বন্ধু বেছে নেয়া যায়।

□

– কাল রাতে ট্যাঙ্ক দেখলাম স্বপ্নে। এর মানে কী?

– মানে হলো, বন্ধু বেড়াতে আসবে।

– সাময়িকভাবে দেশ দখল বলতে কী বোঝায়?
– সামায়িকভাবে পিঠে ছুরি বসানো বলতে যা বোঝায়, তা–ই।

□

– কোন দেশ পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরপেক্ষ?
– চেকোস্লাভাকিয়া। কারণ এখন তা নিজের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে না।

□

– সোভিয়েত সেনাবাহিনী কি চেকোস্লাভাকিয়া ছেড়ে যাবে কখনও?
– যাবে, তবে ভায়া রুমানিয়া।

□

– পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশ কোনটি?
– চেকোস্লাভাকিয়া। কারণ গত এক বছর ধরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চেকোস্লাভাকিয়া ছেড়ে আসছে, অথচ এখনও সীমানা পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি।

□

– হাতকড়া কী?
– বন্ধুত্বের বন্ধন।
– আর ট্যাঙ্ক?
– বন্ধুর দুঃসময়ে সাড়া দেয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স।

(১৯৬৮ সালের অগাস্ট মাসে চেকোস্লাভাকিয়া সরকারের সদস্য দুবচেক, ক্রিগেল এবং আরো কয়েকজনকে হাতকড়া পরিয়ে মস্কো নিয়ে আসা হয়েছিল)

□

প্রাগের সরকারী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে এসেছে চেকোস্লাভাকীয় নাগরিক।

– অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে নিদেনপক্ষে কতো জমা দিতে হবে?

– কুড়ি ক্রোন।

– ব্যাঙ্ক যদি হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে আমার টাকার কী হবে?

– আপনার জমা–রাখা টাকার ব্যাপারে যাবতীয় নিশ্চয়তা দেয় আমাদের রাষ্ট্র।

– যদি আমাদের রাষ্ট্রের খারাপ একটা কিছু হয়?

– আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার গ্যারান্টী দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

– আর যদি খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেরই খারাপ কিছু হয়?

– এমন একটি সুসংবাদের জন্য কুড়ি ক্রোন জলাঞ্জলি দিতেও আপনার আপত্তি?

□

ক্রেতা জিজ্ঞেস করছে পত্রিকা বিক্রেতাকে :

– কী কী দৈনিক পত্রিকা আছে?

– *সত্য* নেই, *সোভিয়েত রাশিয়া* বিক্রি হয়ে গেছে, আছে শুধু তিন কোপেক মূল্যের *শ্রম*।

('সত্য', 'সোভিয়েত রাশিয়া' এবং 'শ্রম' নামের পত্রিকাগুলোর মূল রুশ নাম যথাক্রমে –'প্রাভদা', 'সোভিয়েত্স্কায়া রাসিয়া' এবং 'ত্রুদ')

রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার সমাবেশে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে বক্তা বললেন :

– ক শহরে ক'দিন আগে ইলেকট্রিক স্টেশন খোলা হয়েছে।

দর্শকদের ভেতরে একজন চিৎকার করে বললো :

– আমি আজই এসেছি ওই শহর থেকে। কোনো ইলেকট্রিক স্টেশন নেই সেখানে।

বক্তা তবু চালিয়ে গেলেন :

– একটি রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে খ শহরে

আরেকজন দর্শকের প্রতিক্রিয়া :

– আমি গতকাল গিয়েছিলাম ওই শহরে। ওখানে কোনো রাসায়নিক কারখানা নেই।

বক্তা বললেন নির্বিকার চিত্তে :

– প্রিয় কমরেডরা, শহরে শহরে অতো ঘুরে না বেড়িয়ে আপনাদের উচিত নিয়মিত পত্রিকা পড়া। তাহলে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে আপনাদের।

□

– পুরনো রুশ রূপকথা এবং নতুন সোভিয়েত রূপকথার মধ্যে পার্থক্য কী?

– পুরনো রুশ রূপকথা শুরু হতো এভাবে : *সাত–সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এক দেশে ছিলো এক রাজা,* আর নতুন সোভিয়েত রূপকথা শুরু হয় এভাবে : *সংবাদ সংস্থা তাস–এর মাধ্যমে পাওয়া খবর অনুযায়ী ...*

□

ভিয়েনায় আলোচনার সময় কার্টার জিজ্ঞেস করলেন ব্রেঝনেভকে :

– আপনারা আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠালেন কেন?

– কারণ দেশটির নাম শুরু A দিয়ে।

– একটি সার্বভৌম দেশে সৈন্য পাঠানোর কারণ হিসেবে এটি খুব জোরালো বলে আপনি মনে করেন?

– আমরা শুরু করেছি বর্ণানুক্রমিকভাবে।

□

অ্যাপোলো-১১ চাঁদে নামার পর ব্রেঝনেভ ডেকে পাঠালেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের। ধমকের সুরে বললেন :

– আমেরিকা ওদিকে চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে, আর আপনারা কী করছেন বসে বসে? অচিরেই সূর্যে মানুষ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এটা আমার নির্দেশ।

একজন বৈজ্ঞানিক সবিনয়ে তাঁকে জানালেন :

– কিন্তু, কমরেড ব্রেঝনেভ, সূর্যে যাওয়া দূরে থাক, সূর্যের কাছাকাছি ভেড়াও সম্ভব নয় তার অকল্পনীয় তাপমাত্রার কারণে।

– সে-ক্ষেত্রে আমরা রাতের বেলা যাবো, – বুদ্ধিমানের মতো সমাধান বাতলে দিলেন ব্রেঝনেভ।

□

লুকিয়ে লুকিয়ে সীমান্ত পার হচ্ছে একজন রুশ। টের পেয়ে চিৎকার করে উঠলো সীমান্তরক্ষী :

–দাঁড়ান! কে ওখানে?

চটজলদি প্যান্টের বোতাম খুলে ঝোপের পাশে মলত্যাগের ভঙ্গিতে বসে পড়লো রুশটি। কাছে এগিয়ে এলো সীমান্তরক্ষী। জিজ্ঞেস করলো :

– কী করছেন ওখানে বসে?

– বুঝতে পারছেন না কী করছি?

– ঠিক আছে, দাঁড়ান। পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

রুশটি দাঁড়ালো। সেখানে দেখা গেল, কুকুরের শুকনো বিষ্ঠা।

– এটা তো কুকুরের গু! – ক্ষিপ্ত স্বরে বললো সীমান্তরক্ষী।

– জীবনটা যেমন, গু তো তেমনই হবে।

সোভিয়েত সমাজের ছ'টি পরস্পরবিরোধী বৃত্তান্ত।

দেশে বেকার নেই, কিন্তু কেউ কাজ করে না।

কেউ কাজ করে না, কিন্তু উৎপাদনের হার বাড়ছে।

উৎপাদনের হার বাড়ছে, কিন্তু দোকানে কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

দোকানে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, কিন্তু বাসায় সবার সবকিছু আছে।

সবার সবকিছু আছে, তবু তারা কেন জানি অসন্তুষ্ট।

তারা অসন্তুষ্ট, কিন্তু ভোট দেয় সবসময় সরকারের পক্ষে।

কার দেশের রাষ্ট্রনীতি বেশি নমনীয় – এই বিষয়ে বিতর্ক চলছে ব্রেঝনেভ এবং কার্টারের মধ্যে। স্থির করা হলো, যিনি জোর না খাটিয়ে বেড়ালকে ঝাল মরিচের সস খাওয়াতে পারবেন, প্রমানিত হবে, তাঁর দেশের রাষ্ট্রনীতি বেশি নমনীয়।

সসেজে মরিচের সস মাখিয়ে কার্টার এগিয়ে ধরলেন বেড়ালের দিকে। গন্ধ শুঁকে বেড়াল মুখ ঘুরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

এবার ব্রেঝনেভের পালা। সসেজের লোভ দেখিয়ে বেড়ালকে ডাকলেন তিনি। সে কাছে আসতেই সরিয়ে ফেললেন সসেজ, হাত বোলাতে শুরু

করলেন তার পিঠে, তারপর আচমকা মরিচের সস লাগিয়ে দিলেন তার পশ্চাদ্দেশে। চিৎকার করে উঠলো বেড়ালটি এবং মুহূর্তের মধ্যে চাটতে শুরু করলো নিজের পশ্চাদ্দেশ। ব্রেঝনেভ সগর্বে বললেন :

– দেখেছেন, স্বেচ্ছায় শুধু খাচ্ছেই না, গানও গাইছে।

□

নিক্সন জানতে চাইলেন ঈশ্বরের কাছে, আমেরিকানরা কবে পুরোপুরি সুখী হবে? ঈশ্বর জানালেন :

– আরো পঞ্চাশ বছর পরে।

– ততোদিন কি আর বেঁচে থাকবো! – আক্ষেপ করে বললেন নিক্সন।

পম্পিডু জিজ্ঞেস করলেন ঈশ্বরকে, কবে পুরোপুরি সুখী হবে ফরাসীরা?

– আরো আশি বছর পরে।

– ততোদিন কি আর বেঁচে থাকবো!

ব্রেঝনেভ প্রশ্ন করলেন ঈশ্বরকে, সোভিয়েতরা কবে সুখে-শান্তিতে থাকবে?

– ততোদিন কী আর বেঁচে থাকবো! – আক্ষেপের সুরে বললেন ঈশ্বর।

□

ব্রেঝনেভের বাসার দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো। পকেট থেকে একগাদা চিরকুট বের করলেন তিনি, বেছে নিলেন একটি এবং সেটি দেখে দেখে পড়লেন :

– কে ওখানে?

সোভিয়েত স্কুলের দশম শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপশি নতুন একটি বিষয়ের প্রচলন করা হলো – যৌনবিজ্ঞান। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে শিক্ষক বললেন :

– পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কের ব্যাপারটি অতি স্বাভাবিক এবং এ–ব্যাপারে তোমরা অনেককিছু জানো এবং আরো জানবে ভবিষ্যতে। তবে ছেলে–ছেলে এবং মেয়ে–মেয়ের ভালোবাসার সম্পর্কটি অস্বাভাবিক এবং বিকৃত। এটি আমাদের আলোচনাভুক্ত হবে না। আরো দু'ধরনের ভালোবাসা আছে, সেগুলি হলো – *পার্টির প্রতি জনগণের ভালোবাসা* এবং *জনগণের প্রতি পার্টির ভালোবাসা* । এই দুই ভালোবাসা বিষয়ে আমরা পড়াশোনা করবো সারা বছর।

□

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের হত্যাকান্ডের এক ঘন্টা আগে পলিট–ব্যুরোর সদস্যদের ডেকে পাঠালেন ব্রেঝনেভ, বললেন :

– কায়রো আর মস্কোর সময়ের পার্থক্য ক'ঘন্টা, কে বলতে পারে? একটু আগে জিহান সাদাতকে ফোন করে আনোয়ার সাদাতের হত্যাকান্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছি; অথচ জিহান বললো, আমি নাকি ভুল করেছি। আনোয়ার সাদাত নাকি এখন প্যারেডে হাজিরা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

(১৯৮১ সালে মিলিটারি প্যারেডে হাজিরা দেবার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন আনোয়ার সাদাত)

□

কেজিবি অফিসে ফোন।

– হ্যালো, আমরা আমাদের তোতা পাখি হারিয়ে ফেলেছি।

– দেখুন, এ–নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। আপনি বরং যোগাযোগ করুন ...

– তা আমরা জানি। কিন্তু আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, পাখিটি যা বলে, তা একান্তই ওর নিজস্ব বক্তব্য। আমাদের মতামতের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

□

ঈস্টার উৎসব উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন দশ লাখ ডিম উপহার দিতে চাইলো পোল্যান্ডকে। পোল্যান্ড তা নিতে অস্বীকার করলো। কারণ তারা হিসেব কষে দেখেছে, দশ লাখ ডিম দিতে হলে পাঁচ লাখ সোভিয়েত সৈন্যকে আসতে হবে পোল্যান্ডে।

□

বিদেশীদের জন্য নির্মিত স্পেশাল রেস্টুরেন্টের ডিরেক্টর ঘোষণা করলেন, একদিন আগে অর্ডার দিলে যে কোনো খাবার তিনি সরবরাহ করতে পারবেন। এক বিদেশী পর্যটক পরদিনের জন্য অর্ডার দিলো – আলু সহযোগে জিরাফের ঝলসানো মাংস।

পরদিন দেখা গেল, রেস্টুরেন্টের সামনে জিরাফ বাঁধা। ডিরেক্টর খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে পর্যটকটিকে বললেন :

– আপনার অর্ডার অনুযায়ী জিরাফ যোগাড় করে ফেলেছি, শুধু আলু যোগাড় করতেই সমস্যা হচ্ছে একটু।

□

প্রোপাগান্ডামূলক সমাবেশে বক্তা :

– আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা সারা পৃথিবী জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।

নিক্সন জিজ্ঞেস করলেন ব্রেঝনেভকে :

– আপনাদের দেশে কেউ ধর্মঘট করে না কেন?

– আমাদের দেশের শ্রমিকরা সরকার এবং পার্টির যে-কোনো সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

– হতেই পারে না।

– বিশ্বাস না হলে নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।

এক শ্রমিক সমাবেশে নিয়ে যাওয়া হলো নিক্সনকে। সেখানে তিনি ঘোষণা করলেন :

– কাল থেকে আপনাদের বেতন অর্ধেক করে দেয়া হলো। *(প্রচণ্ড হাততালি)* । কাল থেকে প্রতি দশজনের একজনকে সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে পাঠানো হবে। *(প্রচণ্ড হাততালি)*। কাল থেকে প্রতি পাঁচজনের একজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। *(প্রচণ্ড হাততালি)*।

হাততালি থামার পর হতভম্ব নিক্সন সংবিৎ ফিরে পেলেন এক শ্রমিকের প্রশ্নে :

– ফাঁসির দড়ি কি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবো, নাকি তা ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সরবরাহ করা হবে?

জনতার মাঝে ব্রেঝনেভ।

– কেমন আছেন, কমরেডরা?

– ভালো আছি।

– আরো ভালো থাকতে চান?

– আপনি নির্দেশ দিলে আমরা আরো ভালো থাকবো।

একজন ইহুদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কেজিবি অফিসে।

– আমাদের কাছে খবর এসেছে, আপনি হিব্রু ভাষা শিখছেন। তার মানে ইজরাইল যাবার প্ল্যান আছে আপনার?

– মোটেও না। আমি ধর্মীয় গ্রন্থে পড়েছি, স্বর্গে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে হবে। তাই হিব্রু শিখে রাখছি।

– মৃত্যুর পরে আপনি স্বর্গে যাবেন, এই ধারণা আপনার হলো কোত্থেকে?

– তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না ঠিকই, তবে নরকে যদি যেতে হয়, তার জন্যে রুশ ভাষা তো শেখাই আছে।

□

সমাজতন্ত্রের প্রভাব চাঁদে পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা করলেন ব্রেঝনেভ। চাঁদকে লাল রঙ করে দেয়ার হুকুম দিলেন। রাতে উঠলো লাল রঙের চাঁদ। ব্রেঝনেভ খুশি।

পরদিন রাতে দেখা গেল, চাঁদের গায়ে লেখা : MARLBORO. আমেরিকার কীর্তি।

ব্রেঝনেভের নির্দেশে MARLBORO-র নিচে লেখা হলো : MADE IN USSR.

পরদিন রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ব্রেঝনেভের। MADE IN USSR–এর পাশে লেখা : UNDER THE LICENCE OF PHILIP MORIS, USA.

দেখাচ্ছি ব্যাটা আমেরিকানদের, ভাবলেন ব্রেঝনেভ।

পরদিন রাতে রেগান চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন : *সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আমেরিকাকে সতর্ক করে দিচ্ছে ...।*

(সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি শহরে আমেরিকান লাইসেন্স নিয়ে মার্লবোরো সিগারেট উৎপাদন শুরু হবার পর উপরোক্ত কৌতুকের জন্ম)

কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষক জিজ্ঞেস করছেন শিশুদের :
- সবচেয়ে সুন্দর খেলনা কোন দেশের, বলো তো?
সবাই সমস্বরে :
- সোভিয়েত ইউনিয়নের।
- কোন দেশে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পাওয়া যায়?
- সোভিয়েত ইউনিয়নে।
- কোন দেশের শিশুদের শৈশব সবচেয়ে আনন্দে কাটে?
- সোভিয়েত ইউনিয়নের।
ক্লাসের কোণে বসে কাঁদছিল এক মেয়ে। শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন:
- তানিয়া, কাঁদছো কেন তুমি?
চোখ মুছতে মুছতে তানিয়া বললো :
- আমি সোভিয়েত ইউনয়নে যেতে চাই।

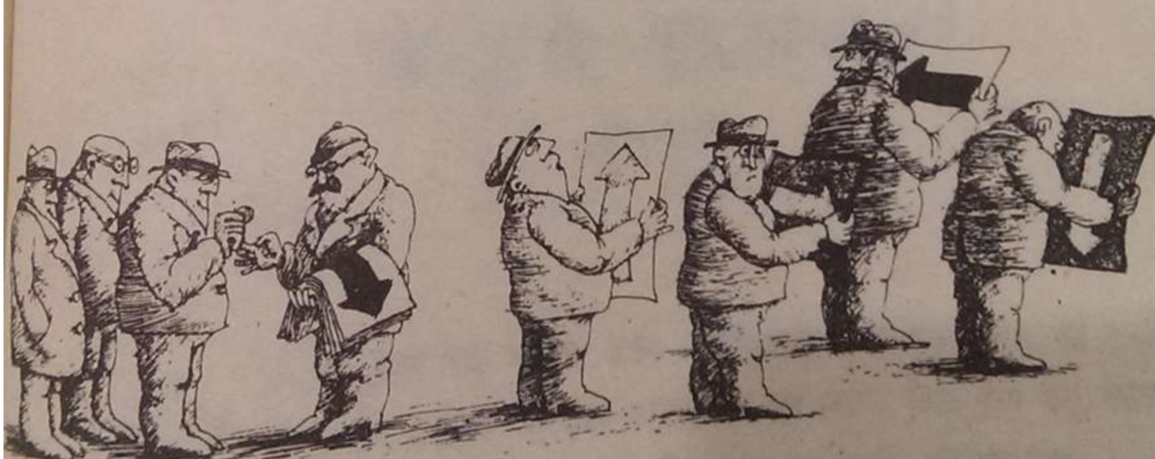

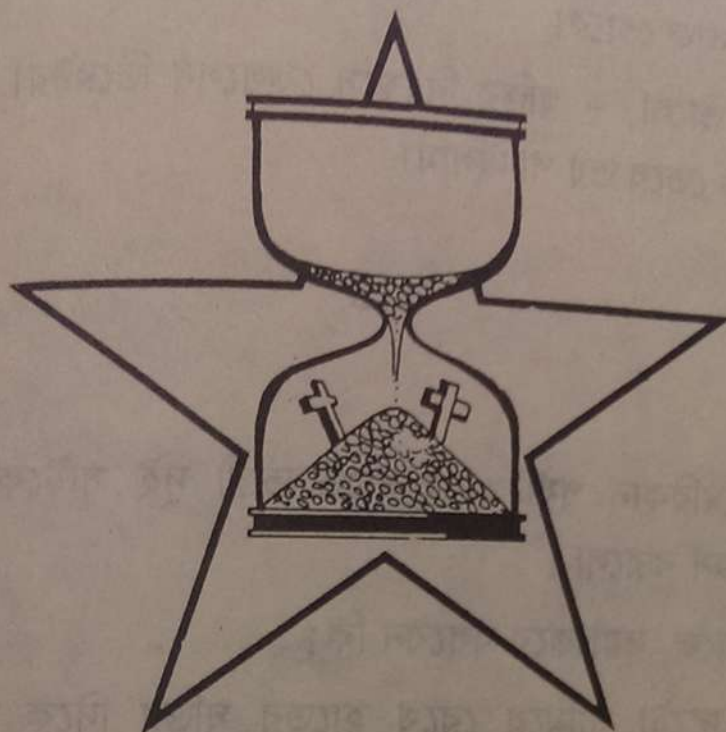

আন্দ্রোপভ–চেরনেন্‌কো পর্ব

(১৯৮২–১৯৮৫)

আন্দ্রোপভের শাসনকাল ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত। প্রাক্তন কেজিবি-প্রধান ক্ষমতা হাতে পাবার পরে সামাজিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন না করেই কিছু নিয়ম-কানুন কঠোর করে ফেলেন। বিলম্বে কাজে আসা, যথাসময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা ইত্যাকার কারণে ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাঁর শাসনামলে।

আন্দ্রোপভের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন আরেক মৃত্যুপথযাত্রী – চেরনেন্‌কো। বস্তুত তাঁর শাসন সোভিয়েত সমাজ এবং জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বিশ্বস্ত ও নিয়মানুবর্তী কর্মচারী ইভান ইভানভ সময়মতো না আসায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন ডিরেক্টর। এমনিতেই এখন এ-ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি। ন'টা বাজলো, দশটা, এগারোটা – তবু তাঁর দেখা নেই। অবশেষে সাড়ে এগারোটায় ফোন করলেন ইভান ইভানভের স্ত্রী, জানালেন – তাঁর স্বামী মারা গেছেন আজ ভোরে।

– তা-ও ভালো, – স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডিরেক্টর। – উনি দেরি করে আসছেন ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম।

□

মস্কোয় আমেরিকান পর্যটক। দু'হাতে ভারী দুই স্যুটকেস-টানা এক রুশকে জিজ্ঞেস করলো :

– ক'টা বাজে, দয়া করে বলবেন কি?

স্যুটকেস দু'টো নামিয়ে রেখে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুশ জানালো:

– এখন সময় এগারোটা তেতাল্লিশ মিনিট আঠারো সেকেন্ড। আজ তেরোই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। আজ পূর্ণিমার আগের দিন। এখন তাপমাত্রা সতেরো ডিগ্রী সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা – শতকরা সত্তর ভাগ, আবহাওয়ার চাপ – ন'শো . . .

তাকে থামিয়ে দিয়ে বিস্মিত আমেরিকান জানতে চাইলো, ঘড়িটা জাপানী কি না।

– না, আমাদের দেশে তৈরি, – রুশটি জানালো খুব গর্বের সঙ্গে।

সোভিয়েত টেকনোলজির অভূতপূর্ব সাফল্য এবং অগ্রগতির জন্য রুশকে অভিনন্দন জানালো আমেরিকান। ঝুঁকে পড়ে ভারী স্যুটকেস দু'টো টেনে তুলতে তুলতে রুশ বললো :

– ঘড়িটি দারুণ, সন্দেহ নেই। শুধু এই ব্যাটারি দুটো একটু ভারী।

– সোভিয়েত সরকার লস-এঞ্জেলেস অলিম্পিকে কাউকে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে কেন?

– কারণ অ্যাথলেটরা ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছেও দৌড় থামাতে না-ও পারে ভেবে।

□

গত একশো বছরে মার্কসবাদীদের বিবর্তন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। টেবিলের ওপরে *ক্যাপিট্যাল*, টেবিলের তলায় ভোদকা। দরজায় কার যেন টোকা। সঙ্গে সঙ্গে *ক্যাপিট্যাল* টেবিলের তলায়, ভোদকা টেবিলের ওপরে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। টেবিলের ওপরে ভোদকা, টেবিলের তলায় *ক্যাপিট্যাল*। দরজায় টোকা। ভোদকা টেবিলের ওপরে, *ক্যাপিট্যাল*ও।

১৯৭০ সাল থেকে আশির দশকের প্রারম্ভ। টেবিলের ওপরে *ক্যাপিট্যাল*, ভোদকা টেবিলের তলায়। দরজায় টোকা। *ক্যাপিট্যাল* টেবিলের তলায়, ওপরে ভোদকা।

আশির দশকের মাঝামাঝি। ভোদকা টেবিলের ওপরে, টেবিলের তলায় *ক্যাপিট্যাল*। দরজায় টোকা। ভোদকা টেবিলের তলায়, *ক্যাপিট্যাল* টেবিলের ওপরে।

□

– আন্দ্রোপভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি মূলত কী ছিলো?

– চেরনেন্‌কোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চূড়ান্ত রিহার্সেল।

□

পরলোকে ব্রেঝনেভের সাথে আন্দ্রোপভের দেখা। ব্রেঝনেভ প্রস্তাব দিলেন:

– এসো, পান করা যাক।

– তারচেয়ে অপেক্ষা করি তৃতীয়জনের জন্য। এসে পড়বে খুব শিগগিরই।

□

– রাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

– রাজতন্ত্রে পিতার কাছ থেকে ক্ষমতা পায় পুত্র, আর সমাজতন্ত্রে – এক দাদুর কাছ থেকে অন্য দাদু।

□

সোভিয়েত নভোচারীর সঙ্গে মহাশূন্য থেকে ফিরে এসে ভিয়েতনামী নভোচারী উত্তর দিচ্ছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের।

– আপনার ডান হাত প্রায় নীল কেন?

– মহাশূন্যযানে যতোবারই কিছু ধরতে গেছি, ততোবারই সোভিয়েত বন্ধুটি হাতে চাপড় মেরে বলেছে : *খবরদার কিচ্ছু ধরবে না* ।

□

লিখিত বক্তৃতা পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠলেন চেরনেন্‌কো। কোনোমতে শেষ করে ক্ষুব্ধ স্বরে সেক্রেটারিকে বললেন :

– তোমাকে বলেছিলাম কুড়ি মিনিটের বক্তৃতা তৈরি করতে, অথচ পুরো এক ঘন্টার বক্তৃতা ধরিয়ে দিয়েছো আমাকে।

সেক্রেটারি জানালেন :

– কুড়ি মিনিটের বক্তৃতা রচনা করে তিন কপি দিয়েছিলাম আপনাকে। আপনি তিন কপিই পড়েছেন।

(১৯৬৯ সালে সামরিক বাহিনীর জেনারেল এপিশেভ অনুরূপ কীর্তি সত্যিই করেছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন পশ্চিমা দেশে পালিয়ে যাওয়া সোভিয়েত গোয়েন্দা সুভোরভ)

বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্ন চেরনেন্‌কোকে :

– শোনা যায়, ডাক্তার বলেছেন, আপনার নাকি খুব ভুলো মন। এ অবস্থায় দেশ চালানো কি খুব দুরূহ হবে না আপনার পক্ষে?

– আমার ভুলো মন? বললেই হলো! ভুলো মন যদি কারো থেকে থাকে, তো তা আন্দ্রোপভের। কতোগুলো মিটিং হলো এর মধ্যে! একটাতেও যদি হাজিরা দিতো!

□

– চেরনেন্‌কো বক্তৃতা দেবার সময় বেশ কয়েকটি মাইক্রোফোন থাকে কেন তঁর সামনে?

– একটি মাইক্রোফোন ধরে থাকেন তিনি অবলম্বন হিসেবে, আরেকটি দিয়ে তাঁকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় এবং আরেকটি মাইক্রোফোন কাজ করে প্রম্পটারের।

□

– সোভিয়েত ইউনিয়ন চালাচ্ছে ক' জন লোক?

– দেড়জন। অমর লেনিন এবং আধমরা চেরনেন্‌কো।

□

চেরনেন্‌কোর মৃত্যুর পর ক্রেমলিনে জনৈকের ফোন :

– হ্যালো, ক্রেমলিন? আপনাদের পার্টির কি নতুন সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজন? আমি তাহলে নিজের নাম প্রস্তাব করতে পারি।

– আপনি কি, মশাই, অসুস্থ?

– হ্যাঁ, আমি অসুস্থ এবং বৃদ্ধ।

চেরনেন্‌কোর মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। তবে তাঁকে সুযোগ দেয়া হলো সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী নরক বেছে নেয়ার। তিনি বেছে নিলেন সমাজতান্ত্রিক নরক। এটা তাঁর সমাজতন্ত্রপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ কি না, তা জানতে চাইলে তিনি বললেন :

– না, তা নয় মোটেও। আমি জানি, পুঁজিবাদী নরকে শাস্তিপর্ব চলে অবিরাম। আর সমাজতান্ত্রিক নরকে সমস্যা লেগেই থাকে। তো দেশলাই নেই, তো কাঠ বা জ্বালানির সংকট, তো চুল্লিটি মেরামতে, তো নরকের কর্মচারিদের পার্টির মিটিং . . .

□

শ্রম দিবসের প্যারেডে হাজিরা দেবার জন্য রাবিনোভিচকে ডাকা হলো কারখানার পার্টি শাখায়। তাঁকে বলা হলো :

– আমাদের কারখানার সবচেয়ে প্রবীণ শ্রমিক হিসেবে আপনাকে কমরেড চেরনেন্‌কোর প্রতিকৃতি বহনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

– না, এই দায়িত্ব আমায় দেবেন না। লেনিনের প্রতিকৃতি নিয়ে প্যারেডে গেছি, লেনিন মারা গেছেন। গেছি স্তালিনের ছবি নিয়ে, মারা গেছেন স্তালিনও। ক্রুশ্চেভের প্রতিকৃতি নিয়ে গেছি। তিনিও গেছেন পরলোকে। ব্রেঝনেভের ছবি নিয়েছি, তিনিও বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। আর এই তো ক'দিন আগেই আন্দ্রোপভের প্রতিকৃতি নিয়েছি, তিনিও মারা গেছেন।

পাশ থেকে একজন শ্রমিক প্রস্তাব দিলো :

– শুধু চেরনেন্‌কোর প্রতিকৃতিই নয়, কমিউনিজমের লাল পতাকাও তাঁকে বইতে দেয়া হোক।

গর্বাচভ পর্ব

(১৯৮৫–১৯৯১)

সারা পৃথিবী তোলপাড় করা পেরেস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্তের প্রবর্তক হিসেবে গর্বাচভ বিশ্বে অতি পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তিনি বাকস্বাধীনতা এবং কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের পরশ দিতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সোভিয়েত অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে তাঁর শাসনামলেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে সফল গর্বাচভ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ছিলেন নিদারুণভাবে ব্যর্থ। তাঁর শাসনকালেই মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হয়ে ওঠে সেখানে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি হাতে না নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি অপ্রিয়ভাজনই হয়ে উঠেছেন শুধু। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য স্থায়ী ব্যাপার হলেও গর্বাচভের আমলে তা প্রকট আকার ধারণ করেছিল। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিও শুরু হয়েছিল তাঁরই শাসনকালে।

লেনিনের শাসনকাল : ঠিক যেন টিউব রেলওয়েতে – চারদিকে অন্ধকার, শুধু সামনে একটি আলো।

স্তালিনের শাসনকাল : ঠিক যেন বাসের ভেতরে – কেউ বসে আছে (রুশ ভাষায় 'বসে থাকা' বলতে জেল খাটাও বোঝায়), বাকিরা কাঁপছে ।

ব্রেঝনেভের শাসনকাল : ঠিক যেন প্লেনের ভেতরে – একজন প্লেন চালাচ্ছে, আর বমি পাচ্ছে বাকি সকলের।

গর্বাচভের শাসনকাল : ঠিক যেন ট্যাক্সিতে – যতো দুরে, ততো বেশি ভাড়া।

□

– দোকানে সাবান এবং ডিটার্জেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

– পার্টিকে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

□

গর্বাচভ গেছেন বাজারে। একজন একটি মাত্র তরমুজ নিয়ে বসে আছে এবং গর্বাচভকে ডেকে বলছে:

– কমরেড গর্বাচভ, আসুন, তরমুজ বেছে নিন।

– বেছে নেবো মানে? আপনার কাছে তো সাকুল্যে একটা তরমুজ।

– তাতে কী? আপনাকেও তো আমরা ওভাবেই বেছে নিয়েছি।

রুশ এবং পোলিশ একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একশো রুবল কুড়িয়ে পেলো। প্রস্তাব দিলো রুশ :

– টাকাটি আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ করে নিই।

– না, ভাই–ভাইয়ের হিসেব বাদ দাও, – বাধ সাধলো পোলিশ। – তার চেয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে নিই।

□

গর্বাচভ ফোন করলেন রেগানকে:

–চ্যালেঞ্জার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

– কিন্তু চ্যালেঞ্জার তো উৎক্ষেপিত হবে আরো এক ঘন্টা পর।

– আমি খুবই দুঃখিত। সময় গড়বড় করে ফেলেছি। আমি বরং পরে ফোন করবো।

□

– শুনেছেন, এখন গ্লাসনস্ত। যা ইচ্ছে তা বলতে পারেন।

– সত্তর বছর ধরে মাথায় মল ঢেলেছে, আর এখন বলছে মুখ খুলতে!

□

ইংরেজ বুলডগের সঙ্গে দেখা হলো সাধারণ রুশ কুকুরের। বুলডগ জিজ্ঞেস করলো :

– তোমাদের ওখানে নাকি এখন পেরেস্ত্রোইকা? তা কেমন কাটছে দিনকাল?

– কীভাবে বোঝাই? খাবার থালা শূন্য বটে, তবে শেকল লম্বা করে দিয়েছে আগের চেয়ে। আর এখন ঘেউ ঘেউ করতে পারি প্রাণ খুলে, কেউ বাধা দেয় না।

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্টের একশোজন প্রেমিকা। তাদের মধ্যে একজন এইড্‌সে আক্রান্ত। কিন্তু ঠিক কে, তা তিনি জানেন না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের একশোজন দেহরক্ষীদের একজন কেজিবি-র এজেন্ট। কিন্তু ঠিক কে, তা তিনি জানেন না।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের একশোজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টার একজনের কাছে সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচিটি আছে। কিন্তু ঠিক কার কাছে, তা তিনি জানেনন্না।

□

– পশ্চিম ইওরোপের সব দেশ থেকে আমেরিকান রকেট সরিয়ে নিলে তারা কি ওয়ারশ জোটের দেশগুলোর আক্রমণ রুখতে পারবে?

– পারবে, যদি সব বোমারু বিমানের পরিবর্তে তারা *চেসনা* বিমান ব্যবহার করে।

(জার্মানির তরুণ ম্যাথিয়াস রাস্ট 'চেসনা' বিমানে চড়ে সোভিয়েত প্রহরা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরাসরি অবতরণ করেছিল রেড স্কোয়্যারে)

□

– পেরেস্ত্রোইকা কেমন চলছে?

– খুব ব্যাপকভাবে। এই তো ক'দিন আগে রেড স্কোয়্যারকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বানানো হয়েছে।

□

– রেড স্কোয়্যারে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

– এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ তো হবেই।

সোভিয়েত রুবলের মুদ্রামান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গর্বাচভ শরণ নিলেন অর্থনীতিবিদদের। তাঁদের একজন প্রতিটি মুদ্রায় চারটি ফুটো করে বোতাম হিসেবে সেগুলো বিক্রির প্রস্তাব দিলেন।

□

গর্বাচভের কানে এলো, দেশের সব মুর্গি মারা যাচ্ছে। প্রত্যেক মুর্গির সামনে কালো রঙের বৃত্ত এঁকে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি। কোনো কাজ হলো না তাতে। গর্বাচভ জারি করলেন নতুন আদেশ। প্রতিটি বৃত্তের ভেতরে হলুদ রঙের বর্গক্ষেত্র এঁকে দিতে হবে। মুর্গিদের মৃত্যুহার কমানো গেল না তবু। এর পরে হলুদ বর্গক্ষেত্রের রঙ বদলে সবুজ করে দেয়ার আদেশ এলো গর্বাচভের পক্ষ থেকে।

এক সপ্তাহ পরে তিনি জানলেন, দেশের সব মুর্গি মারা গেছে। আক্ষেপ করে বললেন গর্বাচভ:

– ইশ! আরো কতো আইডিয়া ছিলো আমার মাথায়!

□

বিছানায় স্ত্রী বলছে স্বামীকে:

– মিখাইল, প্রেসিডেন্টের বউয়ের সাথে শুতে পারবে, এমন কখনও ভাবতে পেরেছিলে?

□

লন্ডনে সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাট ফোন করলেন ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং বিশেষ কাজে ম্যানচেস্টার যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে জানানো হলো, অন্য শহরে যেতে হলে কোনো অনুমতি বা ভিসার প্রয়োজন হয় না, শুধু ট্রেনে চেপে বসলেই হলো।

– কিন্তু আমি তো যাবো গাড়িতে।

– গাড়িতে যান বা ট্রেনেই যান, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

– তেল ভরবো কোত্থেকে? আমার তো তেলের কার্ড নেই।

– আমাদের এখানে কার্ড লাগে না। টাকা দিলে যে–কেউ তেল বেচবে আপনাকে।

টেলিফোন রেখে সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাট রাগে গজগজ করতে লাগলেন:

– এতো বিশৃঙ্খলা! এতো অরাজকতা! সম্ভব না এ দেশে বাস করা।

□

মস্কোর সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে লিথুয়ানিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েত। লান্দ্স্বের্গিস বললেন :

– আমার প্রস্তাব, মস্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

উপস্থিত সকলে হতভম্ব। গুঞ্জন উঠলো চারপাশে। একজন দাঁড়িয়ে বললো:

– কিন্তু যুদ্ধে তো আমরা নির্ঘাত হারবো।

– হারবো, তা আমিও জানি, – বললেন লান্দ্স্বের্গিস। – তাতে কী? জার্মানি হেরেছে, হেরেছে জাপানও। তাকিয়ে দেখুন, তারা এখন কেমন আছে?

□

মস্কোর কাছে এস্তোনিয়ার আকুল আবেদন : তাদেরকে অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য স্বাধীনতা দেয়া হোক। ব্যাপক আলাপ আলোচনার পরে এস্তোনিয়াকে পাঁচ মিনিটের স্বাধীনতা দিলো মস্কো। ভাবলো, পাঁচ মিনিটে কী আর এমন করতে পারবে তারা!

পরদিন *প্রাভদায়* খবর বেরুলো : গতকাল বিকেল চারটেয় এস্তোনিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে সুইডেনের বিরুদ্ধে এবং চারটে বেজে চার মিনিটে আত্মসমর্পণ করে।

গর্বাচভ, বুশ এবং মিতেরাঁ শ্রমিকদের বেতন বিষয়ে আলোচনা করছেন।

মিতেরাঁ বললেন :

– আমাদের দেশে শ্রমিকরা মাসে বেতন পায় গড়ে দু'হাজার ফ্রাঁ। এক হাজার চলে যায় বাড়িভাড়া, খাবার–দাবার, এটা–সেটায়। আর বাকি এক হাজার দিয়ে কী করে তারা, সেটা তাদের ব্যাপার।

বুশ বললেন :

– আমাদের দেশের শ্রমিকদের গড় বেতন দু'হাজার ডলার। এক হাজার খরচ হয় বাড়িভাড়া, খাবার–দাবার এবং গাড়ির পেছনে। বাকি এক হাজার দিয়ে তারা কী করে, সেটা তাদের ব্যাপার।

গর্বাচভ বললেন :

– আমাদের দেশের শ্রমিক বেতন পায় গড়ে পাঁচশো রুবল। আর বাকি দেড় হাজার তারা কোত্থেকে যোগাড় করে, সেটা তাদের ব্যাপার।

□

গর্বাচভ গেছেন আমেরিকা। তাঁর সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় রাইসা গর্বাচভ তাঁর পাশে বসা শেভার্নাদ্‌জেকে অনবরত খোঁচাচ্ছেন আর বলছেন:

–দু'টো সোনার চামচ চুরি করুন না আমার জন্য।

– নিজের বউয়ের জন্য আমি দু'টো নিয়েছি ইতিমধ্যে। আপনি বরং আপনার স্বামীকেই বলুন।

গর্বাচভকে অনুরোধ করলেন রাইসা। গর্বাচভ দু'টো চামচ হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন :

– আমি এখন একটা জাদু দেখাবো। এই দেখুন, চামচ দু'টো আমি আমার পকেটে রাখছি, কিন্তু ও দু'টো বের হবে শেভার্নাদ্‌জের পকেট থেকে।

□

এইডস – বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানের জন্য তা কোনো হুমকি বহন করে না। কারণ জাপান বাস করে একবিংশ শতাব্দীতে, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন – ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

সবজির দোকানে ক্রেতা।

– টমেটো আছে?

– নেই।

– শশা আছে?

– নেই।

– গাজর আছে?

– নেই।

– পেঁয়াজ আছে?

– শুনুন মশাই, এটা সবজির দোকান, ইনফরমেশান ব্যুরো নয়।

□

জাপানী বিজনেসম্যান সোভিয়েত ইউনিয়নে দু'সপ্তাহ কাটানোর পর ফিরে যাচ্ছেন দেশে। এয়ারপোর্টে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলো তাঁকে:

– আমাদের দেশে কী পছন্দ হয়েছে আপনার?

– আপনাদের শিশুদের খুব ভালো লেগেছে।

– আর?

– বললাম তো, শিশুরা চমৎকার।

–আর কিছু পছন্দ হয়নি?

–আপনাদের শিশুরা সত্যি চমৎকার। আর যা কিছু আপনারা হাত দিয়ে বানান, সব যা–তা।

□

ইমিগ্রেশান নিয়ে ইজরাইলে চলে আসা সোভিয়েত ইহুদিদের নস্টালজিয়া দূর করার উপায় বাতলেছেন রাবিনোভিচ :

– তেল আবিবে *জন্মভূমির টান* নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুলতে হবে; সেখানে অর্ডার নেবার জন্য বহুক্ষণ আসবে না কেউ, খেতে দেবে যাচ্ছেতাই, দুর্ব্যবহার করবে, বিল মেটানোর সময় ঠকাবে এবং বেরুনোর সময় পেছন থেকে বলবে গজগজ করে, *শালা ইহুদির বাচ্চা! ভাগ ব্যাটা ইজরাইলে!*